পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী - ডিসেম্বর, ২০১৯

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে 'নেচার'-এর উদ্বেগ
বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি
দেশদ্রোহী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র!
ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতির অস্থিরতা ও শিল্পায়ন
রাতচোরা আলোক দূষণ
স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পুরুলিয়ার কাজের সন্ধান
বন হতে পারে খাদ্যবন
উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ ইকোলজিসম্মত
বিওবি'র অপ্রকাশিত আত্মপ্রচারমূলক বিজ্ঞাপন
কুসংস্কার বিরোধিতা বিতর্ক

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রক্ষা করুন

মূল রচনা ম্যাগদালেনা স্কিপার (প্রধান সম্পাদক, নেচার)
অনুবাদ অরূপ মিত্র

[বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত 'নেচার' পত্রিকার 16ই জানুয়ারি, 2020 সংখ্যায় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন যেসব কান্ডকারখানা চলছে, তা নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নিচের লেখাটি সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের নির্বাচিত অংশের বাংলা অনুবাদ। মূল রচনাটি ইন্টারনেটে নিচের লিংক ব্যবহার ক'রে ডাউনলোড করা যাবে ঃ https://www.nature.com/articles/d41586-020-00085-6]

সরকার এবং রাষ্ট্রশক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে হিংস্র আক্রমণ বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে গোটা পৃথিবী লক্ষ্য করেছে যে ভারতবর্ষের জনগণ- যাদের মধ্যে অধ্যাপক ও ছাত্ররাও রয়েছে - রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। বিভেদমূলক নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (preamble) অংশটি পাঠ ক'রে চলেছেন।

……

বেদনার কথা যে, এই সমস্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রায়শই হিংসার মুখোমুখি হচ্ছে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ছাড় পাচ্ছেন না। সম্প্রতি সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনাটি ঘটে দিল্লির জওহারলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জে.এন.ইউ.), যেখানে ছাত্ররা ছাত্রাবাসের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদেও আন্দোলনে নেমেছিলেন।

……

ভারতের অন্যতম প্রাচীন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং পাশ্ববর্তী রাজ্য উত্তর প্রদেশের অলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই দুটিতেও পুলিশ ঢুকে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের পেটানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙচুর হয়েছে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। জামিয়া মিলিয়ার উপাচার্য নাজমা আখতার জানিয়েছেন যে, পুলিশ নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীদের আঘাত করেছে - এটা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশি আক্রমণের এই ভয়াবহতা যথাযথভাবেই আন্তর্জাতিক স্তরে তীব্র উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। যাঁরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি জে.এন.ইউ.-র প্রাক্তনী এবং এখন আমেরিকার কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক এবং নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী ও লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ভেঙ্কি রামকৃষ্ণাণ, যিনি স্নাতকস্তর পর্যন্ত ভারতেই পড়াশোনা করেছেন- তিনি এই নতুন আইনটিরও একজন সমালোচক।

……

...মুক্তচিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য;... সরকারের যেকোনো নীতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার- কারো দয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়; এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই প্রতিবাদী স্বরকে রক্ষা করা। এভাবে না হ'লে কোনো বিরোধী কণ্ঠস্বরই জনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। বর্তমান সরকারের সদস্য ও সমর্থকদের মনে রাখা উচিত, তাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন না, তখন তাঁরাও এভাবেই জনগণের কাছে পৌঁছেছেন। (নজরটান বা highlights অনুবাদকের।)

ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা সঙ্গত কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন- কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে বলপ্রয়োগ শুরু হওয়ায় এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব যাদরে হাতে, তাদের অবশ্য কর্তব্য হোলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং দেশের মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 42 সংখ্যা 1-4
জানুয়ারী - ডিসেম্বর 2019

Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 34929/79
Vol. XLII No. 1-4
January - December 2019

Contact :
Rabin Majumdar
rabin.majumdar@gmail.com
B27/1, Kalindi Housing Estate,
Kolkata-700 089

Website :
www.scienceandsocietyinbob.com

মূল্য : ত্রিশ টাকা

সূচীপত্র

ভরতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে রক্ষা করুন।
আমাদের কথা পৃ. 2
'বিজ্ঞানমনস্কতা' তথা বৈজ্ঞানিক চেতনা-
বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি...
- সুভাষচন্দ্র গাঙ্গুলী পৃ. 3
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশদ্রোহী ছিলেন!
- রবীন মজুমদার পৃ. 18
ভারতে শিল্পায়নের রূপরেখা ও সীমাবদ্ধতা এবং..
- কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. 25
আলোকের এই ঝর্ণাধারার মৃত্যুবাণ
- শঙ্কর ঘটক পৃ. 37
পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কৃষির...
- রবীন ব্যানার্জি পৃ. 41
বন হোক খাদ্য বন.. স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা
- সুজয় জানা পৃ. 49
মাঠে-যাওয়া
- সুমিত চক্রবর্তী পৃ. 53
পুস্তক পরিচিতিঃ ছড়াতে ছবিতে... বিবরণ
- ধ্রুবজ্যোতি দে পৃ. 57
বিওবি'র আত্মপ্রচারমূলক বিজ্ঞাপন... প্রস্তাব পৃ. 59
চিঠিপত্রঃ কুসংস্কারবিরোধিতা... চিঠির উত্তরে
- সৌমেন গুহ পৃ. 61

মত-প্রকাশে লেখকের স্বাধীনতায় আস্থাশীল বিওবি। বিষয়, উপস্থাপনা এবং প্রসাদগুণই বিবেচনা করা হয়। লেখকের সম্মতিসাপেক্ষে বানান ও যতিচিহ্ন ন্যূনতম সংস্কার ছাড়া কোন রকমে লেখায় হস্তক্ষেপ করা হয় না।

আমাদের কথা

টান পড়েছে, জোর টান। দড়ি ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম। মানুষের ধর্ম বনাম রাষ্ট্রনির্দেশিত ধর্ম, নাগরিক বনাম নথি, বিজ্ঞান বনাম অন্ধবিশ্বাস, ইতিহাস বনাম পুরাণ কাহিনী, উন্নয়ন বনাম দেশপ্রেম এবং ... ইত্যাদি নানা টানাটানিতে বিপর্যস্ত ত্রস্তব্যস্ত ভারতের জনজীবন।

অর্থ-অস্ত্রের টংকার ঝংকার, ভোট-জেতা গরিষ্ঠতার আস্ফালন হুঙ্কার একদিকে, অন্যদিকে লাগামছাড়া বেকারী ও মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-উন্নয়ন গোঁত্তা খেয়ে তলানিমুখী।

লাগ-ভেল্কি-লাগ গোছের রাজনৈতিক নির্মাণের কর্মযজ্ঞ চলছে। বলছে- অধার্মিকতাই সব নষ্টের গোড়া। একটু সবুর কর- রামরাজ্যের পথ পরিষ্কার দেখা যায়- ঐতো!

রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষের সেসব ভাবারও অবকাশ নেই, আপাতত। ছোটো ছোটো, জোগড় করো আগলে রাখো নথি, নথি ছাড়া রেশন পাও, ট্রেনে চড়ো? তাহলে নথি ছাড়া পাবে কেন মাথা গোঁজার ঠাঁই। দেশ?

বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিরা এতদিন মোটামুটি চেনা ছকেই থোড় বড়ি খাড়া খেলেছে। অস্বস্তিকর প্রশ্ন ও সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে ধামাচাপা দিয়ে। নতুন এই ধর্ম-আবেগের রাষ্ট্রীয়তার ছককে তারা না পারছে গিলতে, না পারছে পুরোপুরি অস্বীকার করতে। তাদের উপর মানুষের আস্থা-বিশ্বাস থিতু হচ্ছে না।

আমাদেরই কৃতকর্মের ফল এসব। প্রায় শ'দেড়েক বছরের যে সামাজিক বৌদ্ধিক জাগরণ পেরিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম- যাকে আমরা বলেছিলাম- সীমিত অর্থে হলেও- 'নবজাগরণ', সেও তো ছিল প্রধানত নগর-শহর কেন্দ্রিক। সেটা কোন জাগরণই ছিল না- বলেছিল কেউ কেউ। আজ আবার ফিসফাস- সে ছিল অভারতীয়, বিজাতীয়! একেবারে হালের যে 'বিজ্ঞান আন্দোলন' বিগত শতকের তিন চার দশক জুড়ে যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম আমরাও। আমাদের এই পত্রিকাকে সঙ্গী করে- তাও তো মোটের উপর শহুরে গন্ডীতেই নড়াচড়া করেছে। স্বাধীন ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরাও তো একচোখে দেখেছে সরকারী পদ ও প্রসাদ, অন্য চোখ রেখেছে পশ্চিমে। দেশের জল মাটির দিকে তাকায় নি কেউই, মানুষের কাছে পৌঁছয় নি বিজ্ঞানের বোধ। তাই কি আজ মাথাচাড়া দেয় অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞানের শক্তি? পেছুপানে টানে ইতিহাস?

কিন্তু না, সবটাই বোধহয় ব্যর্থতা নয়। সব আশা শেষ হয় নি। ঐ তো শোনা যায়, কাদের বলিষ্ঠ স্লোগান আর গান- ধর্ম চাই না, ভাত চাই, কাজ চাই, আজাদী চাই। কাগজ আমরা দেখাবো না। কারা গায় জনগণ মন, কারা পড়ছে সংবিধানের প্রস্তাবনা? কারা ওড়ায় জাতীয় পতাকা? ওরা না বখে যাওয়া 'বিভ্রান্ত' হওয়া তরুণদল? ঘরচুলো মেয়েরা, ব্রাত্যজন, প্রান্তিকরা? ওরা ধরে ফেলেছে- এসবই তো জো- হুজুর ভোটব্যাঙ্ক তৈরীর, স্বৈরাচার কায়েম রাখার কৌশল!

আপাতত, তাই আমাদের এই ধূনি জ্বালানো।

'বিজ্ঞান মনস্কতা' তথা 'বৈজ্ঞানিক চেতনা'
—'বৈজ্ঞানিক' অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তি-স্থাপনকারীদের উপলব্ধি ও অনুভবের আলোতে

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী
E-mail : subhasganguly@gmail.com

[যেহেতু নিচের গোটা রচনাটাই উপরে শিরোনামায় উল্লিখিত 'উপলব্ধি ও অনুভবের' (যা চরিত্রগতভাবে 'মতামত' থেকে আলাদা) উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তাই সাক্ষ্যস্বরূপ সেইসব উপলব্ধি ও অনুভবের টুকরো বারে বারেই উপস্থিত করতে হয়েছে। তাতে পাঠের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা কারও কারও হতেই পারে। তা সত্ত্বেও মূল রচনাংশের সাথে এই টুকরোগুলোর নিহিতার্থ একটু মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে পাঠক উপকৃত হতে পারেন। বলা বাহুল্য যে এটা একটা বিনীত পরামর্শ মাত্র। গ্রহণ করা বা না করা পাঠকের ইচ্ছা। - লেখক]

আমাদের নিজেদের মনোজগতের প্রাজ্ঞতা নিয়ে আত্ম-প্রচারে 'বিজ্ঞান মনস্কতা' শব্দটার চল বেশ ব্যাপক। নিচের লেখাটায় এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে যে বহু ক্ষেত্রেই আমাদের এই আত্ম-প্রচারমুখী মনোজাগতিক বৈশিষ্ট্য 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের বা অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে মৌলিক অর্থে নানা অসম্পূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের প্রকৃত চরিত্র কি তা জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে এই জ্ঞান যাঁদের কাছ থেকে এসেছে সে সব বিজ্ঞানীদের নিজেদের প্রস্তাবিত জ্ঞান/অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে নিজেদেরই অনুভব বা উপলব্ধি, যা তাঁদের নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে। অথচ চালু প্রাতিষ্ঠানিক 'বিজ্ঞান' শিক্ষাক্রমে এগুলির উল্লেখ পর্যন্ত থাকে না। এঁদের এইসব অনুভব বা উপলব্ধি'র কিছু কিছু টুকরো উপস্থিত করে তারই ভিত্তিতে নিচের লেখায় আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের দেশের সাক্ষর জনসমষ্টির বিশেষ বিশেষ কিছু মহলে ব্যক্তি'র মনোজগতের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'বিজ্ঞান মনস্কতা' (ইংরাজী 'scientific temper'-এর বাংলা) শব্দটা ব্যবহারের ব্যাপক চল আছে। নিচের আলোচনার চেষ্টা সে ব্যাপারেই। 'বিজ্ঞান মনস্কতা' শব্দটার নিহিতার্থ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীর পিছনে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের (জানা বা এখনও অজানা) অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।

কিন্তু এই শব্দটার ব্যবহারে নিজেদের মনোজগতের প্রাজ্ঞতা নিয়ে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত সদিচ্ছা প্রণোদিত আত্ম-পরিচিতিতে (কখনও কখনও আত্মপ্রচারেও) উৎসাহী আমাদের কিছু কিছু মহলে যেভাবে এটা প্রায় একটা উপাধির মত সোচ্চারে ব্যবহার হয় বা যেভাবে এতে প্রায় একটা যেন উচ্চ পাদপীঠ থেকে কথা বলার বা অন্যদেরকে 'আলোকিত' করার পাদ্রীসুলভ মানসিকতার গন্ধ পাওয়া যায়, তাতে এই শব্দটার অর্থবোধে নানা ধরণের ভ্রান্তি প্রতিফলিত হয়, যার উৎস 'বৈজ্ঞানিক' অন্তর্দৃষ্টি'র অন্তর্নিহিত চরিত্র/বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক 'বৈজ্ঞানিক' শিক্ষাক্রমের একজন ভূতপূর্ব ছাত্র হিসেবে বলতে পারি- এইসব ভুল ভাবনার প্রধান উৎস হল এই শিক্ষাক্রম। 'বৈজ্ঞানিক' অর্ন্তদৃষ্টি যাঁদের কাছ থেকে এসেছে/আসছে তাঁদের নিজেদের কথাতেই সেই অর্ন্তদৃষ্টি'র চরিত্র সম্পর্কে যেসব ধারণা সু-গ্রন্থিত হয়ে আছে তার কোনরকম উল্লেখ এই শিক্ষাক্রমে চোখে পড়ার মত করে অনুপস্থিত।

গোড়াতেই এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা

দরকার যে অনুসন্ধানের যে কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত 'জ্ঞান'কে তখনই 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা দেওয়া হয় যখন 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' ('Scientific Method') নামের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে তাতে পৌঁছান গেছে। এই বিশেষ পদ্ধতি'র উপর প্রচুর রচনা আছে। তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এভাবে দেওয়া যায়ঃ

> ''জ্ঞান লাভের এটা এমন একটা পদ্ধতি যাতে প্রস্তাবিত প্রকল্প'র (hypotheses) গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয় (যন্ত্রের বা পরীক্ষা'র মাধ্যমে) এমন সব প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বা তথ্যের আলোতে যা প্রকাশ্য ও যা সমকক্ষ যে কেউ নিজের করা পুনরাবৃত্তির ভিত্তিতে সমর্থন বা বাতিল করতে পারে।'' (*Quantum Questions - Mystical Writings of The World's Greatest Physicists* Edited by *Ken Wilber,* Shambhala Publications, Massachusetts, USA, 1991, Page 24).

এখন অনুসন্ধানের যে কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-এর জন্য উপরে উল্লেখ করা কোন না কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাব তাঁর বা তাঁদের কাছ থেকেই আসা সম্ভব যাঁরা সেই সব ক্ষেত্র নিয়ে গভীর কৌতূহল থেকে পর্যবেক্ষণ ও ভাবনা-চিন্তার প্রক্রিয়া'র মধ্যে ছিলেন। অন্তর্জীবনের এই সব বৈশিষ্ট্য থেকেই প্রয়োজনীয় 'বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টি'র ('Scientific insights') জন্ম হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (যা প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান-শিক্ষা ও তার সাথে জড়িত পাঠ্য বইয়ে অজানা কারণে অনুল্লিখিত থেকে যায়) যে 'বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টি' চরিত্র বা গুণগত ভাবে দটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্তঃ 'প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি' (elementaray insights) ও বাদবাকী (rest)।

সরাসরি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে যেসব অর্ন্তদৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ পূর্ববর্তী অন্য আর কোন অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে যেগুলিকে ব্যখ্যা করা যায় না (যদিও কখনও কখনও পরবর্তীকালের একই গোত্রের অর্ন্তদৃষ্টি থেকে তাদের কোন কোনটার ব্যাখ্যা আসতে পারে) তাকেই নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি', যার পরিমাণ বা সংখ্যা 'বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের' বিপুল ভান্ডারের অতি ক্ষুদ্র অংশ। যেমন, বিশ্বজগতের সরাসরি নিরীক্ষণ যোগ্য অংশের (Macro-world) সাথে সম্পর্কিত 'বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' (Special & Geneal Theory of Relativity) এবং সরাসরি নিরীক্ষণাতীত জগতের (Micro-world) সাথে সম্পর্কিত 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব' (Atomic or Quantum Theory) ও আরও অল্প কিছু। এই মুষ্টিমেয় 'প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি'ই হ'ল বিপুল 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানভান্ডারের ভিত্তিস্বরূপ।

আর বাদবাকী অন্তর্দৃষ্টি হ'ল 'প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি'র ভিত্তিতে তার থেকে যুক্তির (logic) মাধ্যমে বের করে আনা অন্তর্দৃষ্টি'র ভান্ডার যার প্রতিটি অন্তর্দৃষ্টি বা সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা উপরোক্ত 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' নামের সুসংজ্ঞায়িত পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা'র (experiments) মাধ্যমে স্থির করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হলে তবেই তার যে ভিত্তি সেই 'প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি'ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নইলে ভিত্তিস্বরূপ 'প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি' কখনও সংশোধিত হয় বা কখনও বাতিল বলে বিবেচিত হয়।

'বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের' যে বিশাল ভান্ডার (যার 'সু' ও 'কু' দুরকম প্রয়োগই হতে পারে এবং হয়ও) তার বিপুল সংখ্যাধিক অংশ এই বাদবাকী অর্ন্তদৃষ্টি নিয়েই গড়ে উঠেছে। তার সরাসরি সুপ্রয়োগ থেকেই আমরা প্রতিদিনের নানা সুবিধা ও আরাম পেয়ে থাকি। যেমন, আলো, দ্রুতগামী যানবাহন ইত্যাদি'র জন্য বাষ্প, খনিজ তেল বা বিদ্যুৎশক্তি'র ব্যবহার, বেতার যোগাযোগ, কম্পিউটার ইত্যাদি। আর তার কু-প্রয়োগ সামান্য বা বিপুল ধ্বংস/ক্ষতি (পরিবেশ দূষণ, আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি) ডেকে আনতে পারে ও আনে।

'প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি' আধুনিক 'বিজ্ঞানের' যে ভিত্তি-নির্মাণকারীদের কাছ থেকে এসেছে তাঁদের নিজেদের অন্তর্দৃষ্টির (অর্থাৎ 'বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টি'র) চরিত্র সম্পর্কে নিজেদের অনুভব তাঁদের নানা রচনা

থেকে যা পাওয়া যায় তার কোনরকম উল্লেখ প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক 'বৈজ্ঞানিক' শিক্ষাক্রমে নেই। সেখানের পাঠ্যসূচীতে শুধু প্রাথমিক ও তা থেকে উপনীত অন্যান্য অর্ন্তদৃষ্টিই - নানা সূত্র-তথা-তত্ত্বের ফর্মূলা'র চেহারায় - অর্ন্তভুক্ত। সাথে সাথেই 'বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের' অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যে সব অর্ন্তদৃষ্টি'র চরিত্রের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা না থাকায় সেই বিষয়ে প্রচুর বিভ্রান্তিকর/ভুল ধারণা থেকে যায়। যারা এই শিক্ষাক্রমের ছাঁচে নিজেদেরকে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে এই ভুল ধারণা তাদের পরীক্ষায় ভাল ফল করার পথে বা পরবর্তীকালে বিজ্ঞান-শিক্ষা বা কারিগরী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে কোন সমস্যা হয় না। এবং স্বভাবতই তাঁরা নিজেদের এবং অন্যরা তাঁদের 'বিজ্ঞান-মনস্ক' হিসেবেই মনে করেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ব্যাপক সামাজিক স্তরেও 'বিজ্ঞান-মনস্ক' কথাটার নিহিতার্থ একই থেকে যায়।

'প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি' আধুনিক 'বিজ্ঞানের' যে ভিত্তি-নির্মাণকারীদের কাছ থেকে এসেছে, তাঁদের নিজেদের অর্ন্তদৃষ্টির (অর্থাৎ 'বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টি'র) চরিত্র সম্পর্কে উপরোল্লিখিত নানা অনুভবের দিকে তাকালে দেখব আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম থেকে আসা 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের চরিত্র সম্পর্কিত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ধারণাগুলি নানা দিক থেকেই এই সব অনুভবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর অর্থ, এই ধারণাগুলি সঠিক নয় বা বিভ্রান্তিকর। কাজেই তা থেকে জন্ম নেওয়া 'বিজ্ঞান-মনস্কতা'ও 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে ভুল ধারণা'র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

'প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি' 'আধুনিক বিজ্ঞানের' যে ভিত্তি-নির্মাণকারীদের কাছ থেকে এসেছে নিজেদের অর্ন্তদৃষ্টির (অর্থাৎ 'বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি'র) চরিত্র সম্পর্কে নিজেদের অনুভবের কয়েকটি (সব কটি নয়) দিকে এবার আমরা একে একে তাকাব।

1) 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের অস্থায়ী (Provisional)/ পিছলে পিছলে যাওয়া (elusive)/সন্নিকটস্থ (approimate)/অনিশ্চিত (uncertain) চরিত্র

প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞান বা নিয়মাবলী 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্ব (Theory) ও সূত্রের (Law) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে বোধ হয় অনেকেই একমত হবেন যে প্রচলিত 'বিজ্ঞান মনস্ক'তার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের স্থির-নিশ্চয় চরিত্র-ভিত্তিক বিপুল আস্থা। কিন্তু এইসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্রের চরিত্র সত্যের সন্নিকটস্থ (approximate) - কখনই পুরোপুরি নিশ্চিত এবং চূড়ান্ত অর্থে ঠিক বা নির্ভুল বলে কোন দাবী এইসব তত্ত্ব ও সূত্রের আবিষ্কারকদের অর্থাৎ উপরোক্ত ভিত্তি-নির্মাণকারীদের নেই। তাঁদের উপলব্ধি অনুযায়ীই এর কারণ প্রকৃতি'র গভীর রহস্যাবৃত সত্যাদির স্বরূপ উদঘাটনে মানব মনের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টির সাথে জড়িত কয়েক জনের রচনা থেকে সংগৃহীত অনুভবের কয়েকটি যে টুকরো (সমধর্মী এমন আরও অনেক টুকরোর মধ্য থেকে) নিচে উপস্থিত করা হ'ল তাতেই বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টির এই চরিত্র স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে ঃ

- ''বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণাগুলি মানব মনের মুক্ত/স্বাধীন সৃষ্টি। যতই সেরকম মনে হোক না কেন তা কেবল একান্ত ভাবে বহির্জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বাস্তবকে বুঝতে গিয়ে আমাদের অবস্থাটা অনেকটা এরকম কোন মানুষের মত যে একটা ডালা বন্ধ ঘড়ির কলকব্জার গতিবিধি বাইরে থেকে বোঝার চেষ্টা করছে। সে ঘড়ির চলমান কাঁটাগুলি দেখতে পারছে, এমনকি তার টিক টিক শব্দও শুনতে পারছে, কিন্তু ডালা খোলার তার কোন উপায় নেই। সে যদি উদ্ভাবনে দক্ষ হয় তবে সে হয়তো নিরীক্ষিত সব ঘটনার পিছনের কলকব্জাগুলি সম্পর্কে কোন একটা ছবি তৈরী করতে পারবে; কিন্তু কখনই সে এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হতে পারবে না যে একমাত্র

তার তৈরী করা ছবিই নিরীক্ষিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে পারবে। - আলবার্ট আইনস্টাইন

The evolution of physics- By A Einstein and L. Infeld, The Scientific Book Club in Charing Cross Road, London W.C.

- ...। স্পষ্ট করে যা আমরা বলতে পারি সেটা প্রায় কিছুই না... যা কিছু অস্পষ্ট তার সবই যদি বাদ দেই তবে সম্ভবতঃ আমাদের কাছে পড়ে থাকবে উৎসাহ নেবার একেবারেই অনুপযুক্ত তুচ্ছ কিছু ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় একই কথা (tautologies)। - ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ

  Werner Heisenberg, (Physics and Beyond, Pg 213, First Edition, 1971 Harper & Row, Publishers, New York, Evanston and London)

- যে বাস্তবতাকে আমরা কথায় প্রকাশ করতে পারি সেটা কখনই আসল বাস্তবতা নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যা নিরীক্ষণ করি সেটা প্রকৃতির স্বরূপ নয়, আমাদের প্রশ্ন করার পদ্ধতির সমানে প্রকৃতির উন্মোচিত রূপ। - ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ

  (Werner Heisenberg, Physics and Philosophy, Page 57)

- অজ্ঞতা, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা এইসব ব্যাপারে যে কোন বিজ্ঞানীর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এবং আমি মনে করি এই অভিজ্ঞতা বিশাল গুরুত্বের... আমরা এটা চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেখেছি যে এগিয়ে চলার জন্য আমাদের নিজেদের অজ্ঞতাকে অবশ্যই চিনে নিতে হবে এবং সংশয়ের অবকাশ রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে নিশ্চয়তার নানা মাত্রা জড়িত এক গুচ্ছ উক্তি- কিছু খুবই অনিশ্চিত, কিছু প্রায় নিশ্চিত, কিন্তু কোনটাই একেবারে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত নয়। - রিচার্ড ফাইনম্যান

  (Richard Feynman, Part 5: "The World of One Physicist", "But is it Art?"

- সমগ্র প্রকৃতির প্রতিটি টুকরো বা অংশ সর্বদাই পূর্ণ সত্যের, বা পূর্ণ সত্য বলে আমরা যতদূর জানি তার একটা সন্নিকটস্থ বা কাছাকাছি রূপ (approximation)। বাস্তবটা এই যে, যা যা আমরা জানি তার প্রত্যেকটাই কোন না কোন ধরণের সন্নিকটস্থ বা কাছাকাছি রূপ; কারণ আমরা জানি যে আমরা সব (বৈজ্ঞানিক) সূত্র এখনো জানি না। কাজেই কোন কিছু শিখতে হবে আবার তাকে বাতিল করার জন্যই বা, যেটার সম্ভাবনা আরও বেশী, তাকে সংশোধন করার জন্য। - রিচার্ড ফাইনম্যান

  (Richard Feynman *The Feynman Lectures on Physics* (1964) Vol I, 1-1, Introduction)

- কার্য-কারণ সম্পর্কটা ..., এমন একটা কিছু নয় যা আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই; বরং এটা হ'ল প্রকৃতিকে আমরা যেভাবে দেখতে চাই, সেটা।... আমরা যদি দেখি যে গবেষণা'র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আরও সুবিধেজনক কিছু পাওয়া গেছে তো বহুদিন ধরে গৃহীত সূত্রকেও অনায়াসে বাদ দিতে বাধা নেই। কিন্তু শুধু তা'ই নয়, যখন আমরা দেখব সেটাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে ভুল করেছি, সেই বাতিল সূত্রকেও পুনঃ গ্রহণ করতে পারি। নতুন তথ্যাদি আবিষ্কারের ফলে এই ভুল নজরে আসতে পারে। পরীক্ষামূলক (empirical) এক বিকাশমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ভয় পাবার দরকার নেই, এবং অবশ্যই সে এই ভয় পাবে না যে, বিভিন্ন সময়ের ঘোষণাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতির অভাবের জন্য, সেই বিজ্ঞান বিদ্রূপের শিকার হতে পারে। - এরুইন শ্রোয়েডিঙ্গার

  (Erwin Schroedinger, Chap-V, *Physical Science and the Temper of the Age*, (Page: 93-94) Of Science and The Hu-

man Temperament, (London George Allen & Unwin Ltd., 1935)।

- ... অনেকেই এই অভিমত পোষণ করবেন যে ব্যাপকতর দার্শনিক অবস্থান থেকে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে নজরে পড়ার মত কীর্তি হচ্ছে... এটা চিনতে পারা যে আমরা এখনও চূড়ান্ত বা চরম বাস্তবতার (ultimate reality) সংস্পর্শে আসি নি। প্ল্যাটোর সুপরিচিত উপমা[1] ব্যবহার করে বলতে হয় আমরা এখনও আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমাদের গুহাতেই বন্দী হয়ে আছি ও শুধু দেয়ালের উপর ছায়াগুলো দেখতে পারছি। - জেমস জিনস

  (–James Jeans, *The Mysterious Universe* (Cambridge Univesity Press, 2009 Page 111)

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই সন্নিকটস্থ চরিত্র (approximate character) প্রসঙ্গে নিচের তথ্যাদি খুবই নজর কাড়ার মতঃ

- ''বিশ্বজগতের অজানা রহস্যের পথে অনুসন্ধানকারীদের কাছ থেকে স্থান, কাল ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এই তিনকে এক সাথে নিয়ে তত্ত্বের আকারে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি (আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব - General Theory of relatvity এবং পরমাণু জগৎ (sub-atomic world) সম্পর্কে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি (কোয়ান্টাম তত্ত্ব- Quantum Theory) আজও পর্যন্ত পারস্পরিক দিক থেকে একে অপরের সাথে খাপ খায় না। অন্য ভাবে বলতে গেলে, 'আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব' ও 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব' এই দুই তত্ত্ব যেভাবে এখনও সংজ্ঞায়িত হয়ে আছে তাতে দুটোই একই সাথে সঠিক হতে পারে না।" (*The Elegant Universe* By Brian Greene, (Vintage Books, 1999), Chapter 1, Tied Up with String, Page 3)। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে এই দুই পারস্পরিক অসঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব থেকে যেসব সিদ্ধান্ত/ভবিষ্যৎবাণী বেরিয়ে আসে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ''অকল্পনীয় মাত্রার সঠিকতার সাথে সমর্থিত হয়েছে।" (*The Elegant Universe* by Brian Greene, ibid)

এসব কিছু এই দুই তত্ত্ব বা অর্ন্তদৃষ্টির সাথে যুক্ত দুই অনুসন্ধানকারীর দুটি অনুভবের টুকরো মনে করিয়ে দিতে পারেঃ

- আমরা যেমন ভাবি এই বিশ্বজগৎ (Universe) শুধু তার থেকেই বিচিত্র নয়, আমরা যতটা ভাবতে সক্ষম তার থেকেও বিচিত্র। - ওয়ারনার হাইসেনবার্গ, (*Across the Frontiers* (Essays & and Lectures from 1948 to 1973, Harper & Row Publishers, 1975)
- একজন বলতেই পারে যে ''বিশ্বজগৎ যে বুঝে ওঠার মত সেটাই এক অনন্ত রহস্য''। - আলবার্ট আইনস্টাইন (Physics and Reality, 1936 (Ideas and opinions - Rupa & Co., India, 1989, p. 292)

2) বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টি বা জ্ঞানে পৌঁছন'র পথে প্রকৃতির বিভিন্ন নিরীক্ষিত দিকের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক স্বজ্ঞা (intuition) / কল্পনা বনাম যুক্তি (Logic)

প্রচলিত 'বিজ্ঞান মনস্কতা'র হয়ে সওয়ালকারীদের সওযালে 'বিজ্ঞান মনস্কতা'র প্রায় একটা প্রতিশব্দ হিসেবে 'যুক্তিবাদী' কথাটার সোচ্চার উপস্থিতি কারোরই মনোযোগ এড়াতে পারে না। 'বিজ্ঞান মনস্কতা'র সাথে 'যুক্তি' (Logic)[2] শব্দের এই ধরণের নির্বিচার ব্যবহারের উৎস যে শব্দটার প্রকৃত অর্থবোধে অস্পষ্টতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তা নিচে উপস্থিত করা প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদানকারীদের অনুভবের টুকরোগুলোর দিকে মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে। দেখা যাবে যে কল্পনা

স্বজ্ঞা ইত্যাদি যে মনোজাগতিক বৃত্তিগুলি চরিত্রগতভাবে 'যুক্তিবোধ' থেকে স্বতন্ত্র তাদেরই দৌলতে এই সব প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি'র আবির্ভাব হতে পেরেছে। উল্লেখযোগ্য যে এই বৃত্তিগুলিই কাব্যিক/ শৈল্পিক সৃষ্টির মনোজাগতিক উৎস। যুক্তির ভূমিকা আসে এইসব প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি'র মধ্যে লুকিয়ে থাকা পরবর্তী অর্ন্তদৃষ্টিগুলিকে বার করে আনার ক্ষেত্রে। স্কুল স্তরে পাঠ্য 'ইউক্লিডের জ্যামিতি' এ ব্যাপারে একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান'র মত একটা দৃষ্টান্ত। যাঁরা তার মধ্য দিয়ে গেছেন তাঁদের মনে থাকার কথা যে জ্ঞানের এই শাখাটি শুরু হয় বিভিন্ন আকৃতির (সরল রেখা, বিন্দু ইত্যাদি) কিছু ছবির সংজ্ঞা ও 'স্বতঃসিদ্ধ' নামাঙ্কিত মুষ্টিমেয় কিছু উক্তি দিয়ে, যেগুলিকে কোন প্রমাণ ছাড়াই ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়। এবারে 'যুক্তি' ব্যবহার করে তা থেকে 'উপপাদ্য' বা 'সম্পাদ্য' নামে একের পর এক সিদ্ধান্ত টানা হয় যার গ্রহণযোগ্যতা/সত্যতা হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় এবং সেগুলি কাঠামোগত পরিমাপের নানা প্রয়োজনে (যেমন, জমির আকার ও পরিমাপ থেকে শুরু করে বাড়ী-ঘর, সেতু ইত্যাদির আকার, আয়তন) কাজে লাগে। কাজেই তা থেকে 'প্রমাণ' হয় যে 'স্বতঃসিদ্ধগুলি সঠিক ছিল। কিন্তু তাহলে এগুলিতে পৌঁছানো হয়েছিল কি করে? এখানেই আসে উপরোক্ত স্বজ্ঞা, কল্পনা ইত্যাদির নিজস্ব ভূমিক। নিচের অনুভবের টুকরোগুলিতে বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টির অবদানকারীদের সেই সব মনোজগৎ সংক্রান্ত উপলব্ধিই প্রতিফলিত হয়েছে।

- একজন পদার্থবিদের চূড়ান্ত দায়িত্ব হচ্ছে সেই সব সর্বজাগতিক প্রাথমিক সূত্রগুলিতে পৌঁছনো যা থেকে বিশুদ্ধ অবরোহী যুক্তির পথে (pure deduction) বিশ্বনিখিল (cosmos) নির্মাণ করে তোলা যায়। এইসব সূত্রে পৌঁছান'র কোন যুক্তিসম্মত (logical) পথ নেই; অভিজ্ঞতাকে সহানুভূতির সাথে বুঝে নেওয়ার ভিত্তিতে একমাত্র স্বজ্ঞার (intuition) মাধ্যমেই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব। পদ্ধতিগত এই অনিশ্চয়তার মধ্যে (methodological uncertainty) কেউ ভাবতেই পারে যে পদার্থবিদ্যার যে কোন সংখ্যক তাত্ত্বিক নিয়ম থাকতে পারে, যার সবগুলিই যথাযথ। নিঃসন্দেহে এই মতামত সঠিক। কিন্তু পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশ দেখিয়ে দিয়েছে যে, যে কোন একটি সময়বিন্দুতে, ভাবা সম্ভব এরকম সমস্ত ধারণা'র মধ্যে কেবলমাত্র একটিই অন্যগুলির তুলনায় সর্বদাই ও নিশ্চিতভাবে সর্বোৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। - আইনস্টাইন (Einstein, (*Principles of Research*, Ideas & Opinions, page 226).
- এইসব প্রাথমিক নিয়মগুলি'র আবিষ্কারের কোন যুক্তিবাদী পথ (logical way) নেই। একমাত্র স্বজ্ঞার পথই (way of intition) খোলা আছে; আর তাকে সাহায্য করে আপাত বহিরঙ্গের পেছনে লুকিয়ে থাকা নিয়মের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা অনুভূতি। -আইনস্টাইন

  Prologue to : *Where is science going?* By Max Planck, W. W. Norton & Company, Inc. Publishers, New York, 1932, Pg 10)
- আমি যখন নিজের ও আমার চিন্তার পদ্ধতির দিকে তাকাই তখন আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে নিশ্চিত জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতার থেকেও **স্বপ্নবিলাসের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা** (gift of fantasy) আমার বেশী কাজে লেগেছে। - আলবার্ট আইনস্টাইন

  (Cited as conversation between Einstein and Janos Plesch in *Janos: The Story of a Doctor (1947)*, by Janos Plesch, trasnalted by Edward FitzGerald Page 207 [VICTOR GOLLANCZ LTD., LONDON, 1947] (http:/en.wikiquote.org/wiki/Albert Einstein), Atlantic Monthly, November 1945 (http://

www.websophia.com/faces/einstein.html).

- আমার কল্পনা থেকে বাধাহীনভাবে সংগ্রহ করার মত একজন যথেষ্ট শিল্পী আমি। কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কল্পনা দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে। - আইনস্টাইন

  (In an interview published in the Saturday Evening Post, 26 October 1929, (http://quoteinvestigator.com/2013/01/01/einstein-imagination/)

কোয়ান্টাম তত্ত্ব'র জগৎ সম্পর্কে 'বৈজ্ঞানিক' ধারণার (যার ভিত্তিতে আজ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত ও অতি সুপরিচিত 'কম্পিউটার' নামক যন্ত্রটার জন্ম সম্ভব হয়েছে) ক্ষেত্রে কল্পনা, স্বজ্ঞা, উপমা ইত্যাদির (যা তথাকাথিত 'যুক্তি'র সাথে একেবারেই সম্পর্কিত নয়) ভূমিকা ওই জগৎ সম্পর্কে প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টির অবদানকারীদের অনুভবের টুকরোগুলিতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ঃ

- এটা সত্যি যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সুপরিচিত জগৎ থেকেই শুরু হয় এবং সব শেষে তাকে অবশ্যই সুপরিচিত জগতে ফিরে আসতে হয়, কিন্তু এই যাত্রার যে অংশের দায়িত্বে একজন পদার্থবিদ থাকেন সেটা একেবারেই ভিনদেশী অঞ্চল। সাম্প্রতিক কালের আগে এই দুই-এর মধ্যে যোগসূত্রটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী কাছের ছিল। পদার্থবিদ পরিচিত জগৎ থেকেই তাঁর জগতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করতেন। কিন্তু এখন আর তিনি তা করেন না। এখন তাঁর কাঁচামাল হ'ল ... ইলেকট্রন, কোয়ান্টা... ইত্যাদি... আমাদরে এমনকি এই ইচ্ছেটুকু পর্যন্ত নেই যে ইলেকট্রন ''ব্যাখ্যা'' করি। - এ এডিংটন

  (A. Eddington, *The Nature of the Physical World*, Introduction p. xiii. (Macmillan, 1929)

- আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার থাকা দরকার যে যখন পরমাণু'র কথায় আসি তখন ভাষার ব্যবহার কবিতায় যেমন হয় তেমনই এখানেও। কবিও ঘটনা'র বর্ণনায় যত না মাথা ঘামান তার চেয়ে বেশি মাথা ঘামান রূপক বা উপমা সৃষ্টি'র জন্য। - নীলস বোর

  (Niels Bohr in his first meeting with Werner Heisenberg in early summer 1920, in response to questions on the nature of language, as reported in *Discussions about Language* (1933); quoted in *Defense Implications of International Indeterminacy* (1972) by Robert J. Pranger, p. 11, and *Theorizing Modernism : Essays in Critical Theory* (1993) by Steve Giles, p. 28)

3) 'বিজ্ঞানের' জগৎ এবং বিশ্বজগতের 'রহস্যময়তার' সামনে অভিভূত ও নতজানু ব্যক্তিগত (গোষ্ঠিগত নয়) 'ধর্মীয়' অনুভূতির জগৎ - এই দুইই 'বিশ্বাসের' (faith) উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

প্রচলিত বিজ্ঞান'-পূজা অর্থাৎ 'বিজ্ঞান মনস্কতা'র জগতে একটা বলা বা কখনও সরাসরি না বলা হলেও স্পষ্ট ইঙ্গিত-বাহী একটা জোরদার ধারণা হচ্ছে-'বিজ্ঞানের' অন্যতম লক্ষ্য হল বিশ্বজগতের তথা প্রকৃতির 'রহস্য' উন্মোচন করা। আর এরই সাথে জড়িয়ে আছে রহস্য উন্মোচনকারী হিসেবে বিবেচিত 'বিজ্ঞান' আর রহস্য পুজারী হিসেবে বিবেচিত 'ধর্মকে' চরিত্রগত ভাবে পরস্পর-বিরোধী হিসেবে মনে করা ও সেভাবেই উপস্থাপনা করা।

'প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি'র ক্ষেত্রে অবদানকারীদের নিচের অনুভবের টুকরোগুলো থেকে আমরা দেখতে পাব প্রকৃতিকে 'রহস্য'-মুক্ত (Demystification) করার কোন চেষ্টা, ইচ্ছা বা দাবী সেখানে প্রতিফলিত হয় নি; বরং যে চেষ্টা বা ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে তা হ'ল

বিশ্বজগৎ বা প্রকৃতি'র রহস্যে'র গভীর থেকে গভীরতর স্তরে যাওয়ার; এবং চলমান সেই যাত্রা পথে অভিভূত করা, মাথা নত করে দেওযা বিস্ময়বোধ। আর অন্য দিকে গভীরে এই পথ চলতে চলতেই এঁদের রচনায় বেরিয়ে এসেছে এমন সব অনুভূতি/উপলব্ধির কথা যাতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে এঁদের চোখে 'ধর্ম' ও 'বিজ্ঞান'-এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু এঁরা 'ধর্ম' বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তার সাথে কর্তৃত্ববাদী নানা নামের (হিন্দু, মুসলমান/ইসলাম, খ্রীশ্চিয়ান ইত্যাদি) ধর্মীয় সংগঠনের তরফে ব্যাখাত/প্রচারিত ধর্মের কোনরকম সম্পর্ক নেই। এবং তা তাঁদের নানা সময়ে প্রকাশিত নানা উপলব্ধি থেকেই স্পষ্ট। ধর্ম বলতেই কেবল ভেল্কিতে বাজী মাত করা 'ধর্মীয় গুরু' বাবাদের বা 'ধর্মীয়' কুসংস্কার উল্লেখের যে চল প্রচলিত 'গণ-বিজ্ঞান' আন্দোলনের আঙিনায় দেখা যায় সেটা স্পষ্টতই ধর্মের প্রকৃত ও গভীরতম স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই জন্মেছে। 'বিজ্ঞানের' জগতের অগ্রগামী পথিকরা 'ধর্ম' বলতে যা বুঝিয়েছেন তা যে স্ব স্ব ব্যক্তিগত অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতাজাত ও তা থেকেই ভেসে ওঠা বিশ্বাসের জগৎ (যা চরিত্রতভাবেই কোন তথাকথিত 'যুক্তি'র পথ ধরে আসে না) তা নিচে উপস্থিত করা অনুভবের টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়ঃ

- অনন্ত সময়কাল, প্রাণ ও বাস্তব জগতের বিস্ময়কর কাঠামোর রহস্যময়তা (mysteries) নিয়ে যদি কেউ ভাবতে বসে তো নতজানু হয়ে সম্ভ্রম বোধ (awe) না করে উপায় নেই। প্রতি দিন এই রহস্যময়তা'র সামান্য একটু নিয়েই যদি কেউ ভাবার চেষ্টা করে তো সেটাই যথেষ্ট। - আলবার্ট আইনস্টাইন

  (*Albert Einstein: The human side, new glimpses from his archives*- http://www.websophia.com/faces/einstein.html)

- সবচেয়ে সুন্দর যে অনুভূতি আমাদের হতে পারে তা হ'ল রহস্যময়তার (mysterious) অনুভূতি ... এটা জানা যে আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য এমন কিছু সত্যিই আছে এবং সেটা নিজেকে উচ্চতম প্রজ্ঞা ও বিচ্ছুরণকারী সৌন্দর্য (radiant beauty) হিসেবে প্রকাশ করে, যার শুধু নানা স্থূল চেহারাই (gross forms alone) আমাদের সীমিত মানসিক শক্তির (poor faculties) কাছে বোধগম্য - এই জ্ঞান, এই অনুভূতি... এই হ'ল সত্যিকারের ধর্মীয় মানসিকতার অর্ন্তবস্তু এবং একমাত্র এই অর্থেই আমি নিজেকে গভীর ভাবে ধার্মিক মানুষদের এক জন মনে করি। - আলবার্ট আইনস্টাইন

  (The World as I see it, 1933, (Ideas & Opinions, Rupa & Co., India, 1989, Pg.11)

- নিজস্ব কোন ধর্মীয় অনুভূতিবিহীন (without a religious feeling of his own) এমন একজনকেও গভীর চরিত্রের বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্নদের মধ্যে (among the profounder sort of scientific minds) খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু সেটা অনপঢ় (naive) মানুষের ধার্মিকতা থেকে স্বতন্ত্র। শেষোক্তের কাছ ভগবান একটা সত্তা (being)... যেমন একজন শিশুর কাছে তার বাবা। ... কিন্তু বিজ্ঞানী রয়েছেন বিশ্বজাগতিক কার্য-কারণ বোধের মুঠোয় (prossessed by the sense of universal causation)... তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি এক পরমানন্দময় বিস্ময়ের চেহারা নেয় প্রাকৃতিক নিয়মের সেই ঐকতান বা সঙ্গতির প্রতি, যা এমন এক উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ করে যে তার সাথে তুলনায় মানুষের সমস্ত নিয়মানুগ চিন্তা ও কর্ম একেবারেই গুরুত্বহীন প্রতিফলন। এই অনুভূতিই তাঁর জীবন ও কর্মের নীতি-নির্ধারক...।

প্রশ্নাতীতভাবে এটা সেই অনুভূতির খুবই কাছাকাছি যা বিভিন্ন যুগের ধর্মীয় প্রতিভাদের (religious geniuses) আবিষ্ট করে রেখেছে। - আলবার্ট আইনস্টাইন

(Albert Einstein, The Relgious Spirit of Science, 1934. Ideas & Opinions, Page-40)

- বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে আছে যে, সমস্ত ঘটনাবলী (যার মধ্যে মানব জাতির কর্মকান্ডও পড়ে) প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দ্বারা নির্দিষ্টায়িত। কাজেই এটা বলাই চলে যে এক জন গবেষক বৈজ্ঞানিকের এ ধরণের কোন বিশ্বাসের প্রতি ঝোঁক থাকবে না যে প্রার্থনা করে অর্থাৎ কোন এক অতিপ্রাকৃত সত্তার কাছে নিজের ইচ্ছা নিবেদন করে ঘটনাবলী প্রবাবিত করা যায়। কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এই সব নিয়মাবলী সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান এক অসম্পূর্ণ কাজের টুকরো মাত্র। কাজেই সব কিছুকে বিজড়িত করা ভিত্তিস্বরূপ নিয়মাবলীর অস্তিত্বের উপর আগাম আস্থা রাখাটাও এক ধরণের বিশ্বাসের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সাফল্যের দ্বারা এই বিশ্বাস বড় মাপেই সমর্থনযোগ্য। অন্য দিকে আবার গুরুত্ব সহকারে বিজ্ঞানের পথে চলায় নিমগ্ন আছেন এমন যে কেউ এই বিশ্বাসে পৌঁছে যান যে প্রকৃতিক নিয়মাবলী মানুষের থেকে অনেক উচ্চ স্তরের এক সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে এবং তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী আমাদেরকে নম্র বোধ করতেই হবে। কাজেই বিজ্ঞানের পথে চলা এক বিশেষ ধরণের ধর্মীয় অনুভূতির (religious feeling of special kind) দিকে আমাদের নিয়ে যায়।... - আলবার্ট আইনস্টাইন

(A. Einstein, 24 January 1936 letter in response to a sixth-grader (Phyllis Wright) asking whether scientists pray, and if so, what they pray for ['Einstein and Religion: Physics and Theology' (1999) by Max Jammer, p. 92-93] (https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein)

- মনুষ্য জগৎ ছাড়িয়ে বিশ্বজগৎ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করাতে একাট গভীর আনন্দ রয়েছে, আনন্দ রয়েছে এরকম ভাবনায় যে মানুষ না থাকলে- এর বিশাল ইতিহাসের একটা বড় অংশ সেরকমই ছিল- এটা কি রকম হত... প্রাণকে এই মহাজাগতিক গভীরতম রহস্যের অংশ হিসেবে দেখাটা এমন এক অভিজ্ঞতা যা খুবই বিরল ও খুবই রোমাঞ্চকর। ... এইসব বৈজ্ঞানিক ভাবনা এক অভিভূত করা বিস্ময়বোধ ও রহস্যময়তায় এসে শেষ হয়, এক অনিশ্চয়তার কিনারে এসে হারিয়ে যায়। ... কেউ আমাকে বলতেই পারে যে আমি এখুনি এক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছি। ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে হয় বলতেই পারেন। - রিচার্ড ফাইনম্যান

(Richard P. Feynman, *The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist)*

'বিজ্ঞানের' জগতের পথসন্ধানী-তথা-পথপ্রদর্শকদের মনোজগতে প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধানে এই অনিশ্চয়তার অনুভব ও তারই সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত 'ধর্মীয়' অনুভূতির ছবি (যার সাথে চরিত্রগতভাবে উপরোল্লিখিত নানা নামের সংগঠিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই) কণা-বিদ্যার (Quantum Theory) ক্ষেত্রে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় তাঁদের রচনা থেকে সংগৃহীত নিচের কয়েকটি টুকরো থেকে পাওয়া যাবেঃ

- সংক্ষেপে বলতে গেলে অবস্থাটা এই রকম... পদার্থ বিজ্ঞানের পদ্ধতি'র মাধ্যমে বর্হিজগতের উপর অনুসন্ধান আমাদের কোন মূর্ত বাস্তবে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় এক প্রতীকি চিহ্ন সম্বলিত ছায়াময়

জগতে, যাকে ভেদ করে তার নিচে যাওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অনুপযুক্ত। ...পদার্থবিদ্যা অত্যন্ত জোরের সাথে এই কথা বলে যে এর পদ্ধতিগুলি প্রতীকবাদ (symbolism) ভেদ করে তার পেছনে যায় না। - আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন

(Arthur Stanley Eddington, *Science and the Unseen World* (New York; Macmillan, 1929) Page-36)

- পারমানবিক তত্ত্ব থেকে পাওয়া পাঠের বা শিক্ষার সাথে সমান্তরাল একটা কিছুর জন্য জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত সেই ধরণের সমস্যার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে যার মুখোমুখি হতে হয়েছে বুদ্ধ বা লাওটজু'র মত চিন্তাবিদদের, যখন তাঁরা অস্তিত্বের বিশাল নাটকে একই সাথে দর্শক ও অভিনেতা, আমাদের এই দুই অবস্থানকে এক তানে বাঁধতে চেয়েছেন। - নীলস বোর

Niels Bohr, Address at the Physical and Bilogical Congress in memory of Luigi Galvani, Bologna, October 1937. (Biology and Atomic Physics, Atomic Physics & Human Knowledge, P-20, John Wiley & Sons, Inc. 1958)

উপরের অনুভবের টুকরোটিতে যে ধরণের 'সমান্তরাল' চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে তার কথা বলতে গেলে 'বিজ্ঞান' ও 'ধর্ম' এই দুই জগতের অনুভবের প্রকাশের ভাষার মধ্যে পর্যন্ত লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, পরমাণু জগতের (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি) প্রেক্ষাপটে নিচেরটি 'বিজ্ঞান' মহল থেকে আসা একটি অনুভবের টুকরোঃ

- ধরুন, আমরা যদি জিজ্ঞেস করি ইলেকট্রনের অবস্থান এক জায়গাতেই থাকছে কিনা, অবশ্যই আমাদের উত্তর হবে 'না'। আবার আমরা যদি জিজ্ঞেস করি ইলেকট্রনের অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে কি'না; অবশ্যই আমাদের উত্তর হবে 'না'। - রবার্ট ওপেনহাইমার

(Robert Oppenheimer, *Science and Common Understanding,* (Oxford University Press, London, 1954, Page-42-43)

ফ্রিটযফ কাপরা (Fritjof Capra) তাঁর 'দি তাও অফ ফিজিক্স' (The Tao of Physics'–Flamingo, London, 1993) বইটিতে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে উপরের অনুভবের টুকরোতে "আত্মিক/আধ্যাত্মিক জগতের অভিজ্ঞতা/অনুভব সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় এক রচনা- 'উপনিষদ'-এ- যা লেখা আছে তার প্রতিধ্বনি রয়েছে" :

এটি চলে, চলে না
এটি দূরে, এটি কাছে,
এটি এসব কিছুর মধ্যে
এটি এসব কিছুর বাইরে। - ইশ উপনিষদ

পাছে ভুল বোঝার কোন অবকাশ থাকে তাই এখানে এটা যোগ করা দরকার যে উপরের এই অনুভবের টুকরোটা বা উপস্থিত করা অন্য অনুভবের কোন টুকরোতেই এমন কোন ইঙ্গিতমাত্র নেই যে 'বৈজ্ঞানিক' এবং 'ধর্মীয়' উপলব্ধি বা অর্ন্তদৃষ্টি পারস্পরিক বিকল্প হতে পারে। এদের প্রতিটির স্ব স্ব খোঁজার ও তার থেকে জাত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র রয়েছে। এখানে যার ইঙ্গিত রয়েছে তা হ'ল 'ধর্ম'কে যদি উপরের নিহিতার্থে বোঝা হয় তো চালু ব্যাপক ধারণা'র বিপরীতে এই দুইয়ের মধ্যে কোন অর্ন্তনিহিত/পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি। কণা-বিদ্যার ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের অন্যতম একজন পথিকৃতের নিচের অনুভবের টুকরোটিতে এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছেঃ

- গালিলিও'র বিচারের পর থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বারে বারে দাবী করা হয়েছে যে বৈজ্ঞানিক সত্যকে জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যার সাথে মেলান যায় না। যদিও আমি এখন এ

ব্যাপারে নিশ্চিত যে বৈজ্ঞানিক সত্য তার নিজস্ব ক্ষেত্রে আক্রমণের অতীত, কিন্তু তা বলে ধর্মীয় চিন্তাকে মনুষ্যজগতের ফেলে আসা স্রেফ এক অতীত পর্বের অংশ হিসেবে বাতিল করা যায় না, অর্থাৎ এমন একটা অংশ যাকে এখন থেকে আমাদের পরিত্যাগ করে চলতে হবে। কাজেই আমার জীবৎকাল জুড়েই এই দুই চিন্তাজগতের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বারে বারেই আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, তারা যে বাস্তবতার (reality) দিকে আঙুল দেখাচ্ছে তাকে সন্দেহ করতে আমি সমর্থ হই নি। - ওয়েরনার হাইসেনবার্গ (Werner Heisenberg, *Scientific and Religious Truth*, 1973, (Across the Frontiers, Ch. 26-P 213)

গালিলিও'র সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহজগতের সঠিক প্রস্তাবনার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টধর্মীয় ক্ষমতার কেন্দ্রের হাতে নিগ্রহের যে উল্লেখ উপরোদ্ধৃত অনুভবের টুকরোতে আছে তাকেই 'ধর্ম' ও 'বিজ্ঞানের' দ্বন্দ্বের একটা উদাহরণ হিসেবে দেখান'র চল এখনও খুবই ব্যাপক। কিন্তু এটা ওই চূড়ান্ত দুঃখজনক ঘটনার আসল উৎস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্যের ব্যাপারে অজ্ঞতার একটা উদাহরণ।

খ্রিষ্টীয় ধর্মের তৎকালীন পৃথিবী-কেন্দ্রিক ধারণার জায়গায় সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের প্রস্তাবনার জন্য 1633 সালের 22শে জুন তারিখে 69 বছর বয়স্ক গ্যালিলিও'র বিচার শুরু হয়। শারীরিক অত্যাচার, কারাবাস ও পুড়িয়ে মারার ভয় দেখিয়ে তাঁকে হাঁটু গেড়ে বসে স্বীকার করান হয় যে এক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত ধারণা ভুল ও খ্রিষ্টীয় ধারণাই ঠিক। বিচারে তাঁকে বাদবাকী জীবন গৃহবন্দী রাখা হয় ও তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক জগতের ধারণা সম্বলিত বইটি (Dialogue on the Great World Systems, Ptolemaic and Copernican) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সংগঠিত খ্রিষ্টীয় ধর্মের তৎকালীন ক্ষমতার কেন্দ্র ইতালির রোম শহরে কেন্দ্রস্থ রোমীয় ক্যাথলিক চার্চ ছিল এই 'বিচার' নামক প্রহসনের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব; আর সেই রোমীয় ক্যাথলিক চার্চের সর্বময় কর্তা ছিলেন 1623 সালে কর্তৃত্বের আসনে বসা পোপ আরবান 8 (Pope Urban VIII), যাঁর আসল নাম মাফেও বারবেরিনি (Maffeo Barberini)। এই বারবেরিনি (Barberini) বংশ প্রভূত অর্থ / সম্পদ আহরণ করেছিল এবং প্রচণ্ড প্রভাবশালী ছিল। এই আসন পাওয়ার ফলে তাদের পরিবারের আর্থিক রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও বাড়ে। এই মাফেও বারেবেরিনি তার এক ভাই ও দুই ভাইপোকে প্রধান পাদ্রী করেন। এই সব তথ্য থেকেই তৎকালীন চার্চের অর্থাৎ সংগঠিত- তথা প্রাতিষ্ঠানিক 'ধর্মের' আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্পষ্ট ছবি বেরিয়ে আসে, যার সাথে খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্দিত ন্যাজ্যারেথের অর্ধনগ্ন যীশুর - যাঁকে তাঁর নিজস্ব আত্মোপলব্ধির বাণী প্রচারের জন্য তৎকালীন ধর্মীয় ক্ষমতা কেন্দ্রের রোষের শিকার হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল- সাথে কোন সম্পর্ক আছে বলে কল্পনা করাও কঠিন।

আর স্বয়ং গ্যালিলিও সম্পর্কে জানা যায় যে,

- "... ইনি ধর্মকে উপহাস করা কোন নাস্তিক (atheist) ছিলেন না। ... তিনি নিজে ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে গেছেন, তাঁর দুই কন্যাই খ্রীষ্টিয় সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন, এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি নিজেকে পবিত্র জননীস্বরূপ গির্জার অটল আনুগত্যসম্পন্ন পুত্রস্বরূপ মনে করতেন। অন্য কথায়, তিনি অনুভব করতেন যে তিনি খ্রীষ্টিয় ধর্মকে রক্ষা করতে চাইছেন, আঘাত করতে নয়। তিনি মরিয়া চেষ্টা করছিলেন চার্চ যেন এমন একটা তত্ত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা না করে যাকে, তাঁর মতে, ভুল প্রমাণ করা যায়। তাঁর এই অবাক করে দেওয়া ধারাবাহিক আনুগত্যের সাক্ষ্য 1640 সালে (অর্থাৎ বিচারের সাত বছর পরে, যখনও তিনি গৃহবন্দী ও

অন্ধ) ফরচুনিও লিসেটিকে (Fortunio Liceti) লেখা একটা চিঠিতে পাওয়া যায়। চিঠিটা ছিল বিশ্বজগৎ সসীম না অসীম এই প্রশ্ন নিয়ে। তিনি চিঠি শেষ করেন এই কথা বলে যে 'একমাত্র খৃষ্টিয় ধর্মশাস্ত্রই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে- স্পষ্টতঃই একজন ধর্মবিশ্বাসী, যাকে কোনক্রমেই এক বিস্ফারিত নয়নের বিপ্লবী বলা যায় না।

- *Great feuds in science : ten of the liveliest disputes ever* by Hal Hellman, Pages 2-3 (John Wiley & Sons, Inc. 1998)

উপরের আলোচনার সাধারণীকরণ করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে নির্দিষ্ট নামাঙ্কিত সব ধর্মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য যে সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃত্বের কর্মকান্ড ও প্রচারিত বাক্যাবলির সাথে- গভীরতম, সাধারণ ও শ্রেষ্ঠ অর্থে এবং 'ব্যক্তিগত অনুভবের স্তরে- 'ধার্মিকতা'র কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। এবং গ্যালিলিও'র শান্তিদাতা খ্রিষ্টীয় ধর্মের কর্তৃত্বের মত কিম্বা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সাথে যুক্ত প্রাক খৃষ্টীয় ধর্মীয়-তথা-রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মত আজকের ভারতবর্ষে 'হিন্দু' ধর্মের নামে ক্ষমতাসীন যে যে রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী অন্যান্য নানা নামের গোষ্ঠি/সংগঠন যেসব কান্ডকারখানা (কাজে ও কথায়) চালাচ্ছে তা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আত্মিক ঐতিহ্যবাহী রচনাবলী (উপনিষদ - যাতে 'হিন্দু' শব্দটাই অনুপস্থিত) ও তার পরবর্তীকালে গোষ্ঠী- আনুগত্যহীন মুখপাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া উপলব্ধি-ভিত্তিক বাণীর একেবারে বিপরীত। যেমন, উপনিষদেরই এক সুপরিচিত বাণী 'বসুধৈব কুটুম্বকম'।

উপরোক্ত কান্ডকারখানা ব্যাপক গণস্তরে যূথবদ্ধ আচরণ, যা বহু সময়েই বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের রূপও নেয়। তবে যূথে যূথে সংঘর্ষ শুধু ধর্মভিত্তিক হয় এই ধারণা বাস্তবানুরাগী নয়। আমাদের ও অন্যান্য দেশে ভাষাভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক সংঘর্ষ বিভিন্ন সময়েই দেখা গেছে।

উপরের অনুভবের টুকরোগুলোর নিহিতার্থের আলোয় এটা উপলব্ধি করতে অসুবিধা না'ও হতে পারে যে ধর্ম বলতেই কেবল পার্থিব ব্যাখ্যাযোগ্য যাদু খেলাকে লোক ঠকান 'ধর্মীয়' অলৌকিক ক্ষমতার নামে চালাতে অভ্যস্ত ভেল্কিতে বাজী মাত করা 'ধর্মীয় গুরু' বাবাদের উল্লেখের যে চল প্রচলিত 'গণ-বিজ্ঞান' আন্দোলনের আঙিনায় দেখা যায় সেটা স্পষ্টতঃই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই জন্মেছে। এটা খুব একটা অজানা বা গোপন খবর নয় যে বেসরকারী মালিকানাধীন হাসপাতালগুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের একাংশ বহু সময়েই মালিকদের স্বার্থে অর্থাৎ আয় বাড়ান'র জন্য রোগীদের অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-ইত্যাদির নিদান দিয়ে থাকেন। কিম্বা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর অঘোষিত এজেন্ট হিসেবে কাজ করে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন ওষুধ রোগীদের প্রেসক্রিপশনে লেখেন। তাঁদের এই আচরণকে চিকিৎসাবিদ্যার প্রকৃত চরিত্রের পরিচায়ক ধরে নেওয়াটা যদি ভুল হয় তবে উপরোক্ত 'ধর্মীয়' গুরুদের কর্মকান্ডকে 'ধর্মে'র প্রকৃত চরিত্রের পরিচায়ক ধরে নেওয়াটা একই রকম ভুল হবে।

4) 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের বাইরেও অন্যতর ক্ষেত্রে জ্ঞানের অস্তিত্বের সম্ভাবনা

উপরের আলোচনার সূত্র ধরেই আর একটা বিষয়েও একটু মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের উপরের আলোচিত দিকগুলি সম্পর্কে সচেতনতা, জ্ঞান লাভের সম্ভাব্য উৎস বা ক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের আত্মঘোষিত 'বিজ্ঞানমনস্কদের' মনোজগৎকে একটা দ্বার-বন্ধ জগতে আটকে রাখার বদলে আর একটু উন্মুক্ত দ্বারসম্পন্ন জগতে নিয়ে যেতে পারে কি'না; অর্থাৎ, কোন কোন ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' ছাড়াও জ্ঞান লাভের অন্য কোন উপায় বা

শাখাও বিবেচনাযোগ্য কি'না। নাকি আমাদের অজানা এ'ধরণের কোন শাখা থেকে প্রস্তাবিত/আগত সব অন্তর্দৃষ্টিকেই ভাল করে বিবেচনার অপেক্ষা না রেখে সব সময়েই এক সর্বজ্ঞ, উন্নাসিক সুরে রাতারাতি বাতিল করে দেওয়াটাই 'বিজ্ঞান মনস্কতার' একমাত্র লক্ষণ। পরিবর্তে অজানা কোন শাখা থেকে প্রস্তাবিত কোন ধারণা'র ক্ষেত্রে, ''আমি জানি না'' এমন মনোভাবই কাম্যতর কি'না।

এ প্রসঙ্গে 'প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি' যাঁদের কাছ থেকে এসেছে তাঁদের এক জনের নিচের অনুভবের টুকরোটি অনুধাবনযোগ্য বলে মনে হয়ঃ

- সত্য ও জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে যে'ই নিজেকে বিচারকের ভূমিকায় বসাবে ভগবানের অট্টহাসিতে তার জাহাজ ডুবি হবে।

  "Whoever undertakes to set himself up as a judge in the field of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods"
  - Albert Einstein: *Aphorism For Leo Baek*, 1953 (*Ideas and Opinions*-Rupa & Co. India, 1989, Pg 28)

এখানে একটা সাক্ষ্য উপস্থিত করা হচ্ছে যে উপরের অনুভবের টুকরোটি যাঁর কাছ থেকে এসেছে তাঁর আচরণও নিজের এই খোলাখুলি বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আপটন সিনক্লেয়ার (Upton Sinclair) নামে এক লেখকের অনুরোধে তিনি (আলবার্ট আইনস্টাইন) প্রথমোক্ত'র 'মেন্টাল রেডিও' ('Mental Radio', Charles G Xhomas, U.S.A., 1962) নামের একটি বই-এর ভূমিকা লিখেছিলেন। এই বইটিতে 'টেলিপ্যাথি'র- অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত উপায়ে (extrasensory means), বা মুখে উচ্চারণ না করেও একজনের মনের কথা আর এক জনের কাছে পৌঁছে যাওয়ার - দাবী'র সত্যতা দেখান'র চেষ্টা হয়েছে। আত্মঘোষিত বিজ্ঞান পূজারীরা সাধারণতঃ এই শব্দটিকে বিদ্রূপের সাথে উল্লেখ করে থাকেন। আইনস্টাইনের ভূমিকাতে এই দাবী গ্রহণ বা বর্জন কোনটাই করা হয় নি। তিনি এটুকুই মাত্র বলেছেনঃ ''আমি নিশ্চিত ভাবে মনে করি যে এই বইটি শুধু অবিশেষজ্ঞ জনসাধারণের নয়, পেশাগত ভাবে মনস্তাত্বিকদের আন্তরিক বিবেচনার অপেক্ষা রাখে''। আবারও 1946 সালে এক জন মনঃসমীক্ষাবিৎকে (psychoanalyst) লেখা এক চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেন, ''যাই হোক না কেন, আমার মনে হয় টেলিপ্যাথি'র সম্ভাবনাকে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আগে ভাগেই বাতিল করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমাদের বিজ্ঞানের ভিত্তি এই ভাবে বাতিল করার দিক থেকে অতি অনিশ্চিত ও অতি অসম্পূর্ণ। [Gardner M. 1989: *Science, Good, Bad and Bogus*, Buffalo (NY), Prometheus Books, Page 15, as quoted in PHYSICS BEFORE AND AFTER EINSTEIN, Edited by Marco Mamone Capria, Publisher IOS Press Nieuwe Hemweg 681013BG Amsterdam Netherland, 2005]

উপসংহার

অনেকের কাছে অতিরিক্ত/অপ্রয়োজনীয় লাগার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের আবার মনে করিয়ে দেবার একটা তাগিদ বোধ থেকে শুরুতে বলা কথার পুনরাবৃত্তি করেই বলছি, প্রাসঙ্গিক/প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও সূত্র নিয়ে গড়া প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক 'বিজ্ঞানশিক্ষার' জগতের পাঠক্রমে এই সব তত্ত্ব ও সূত্রের চরিত্র সম্পর্কে খোদ প্রণেতাদের আলোকসম্পাতকারী চিন্তা/অনুভবগুলি পুরোপুরি অনুল্লিখিত থেকে যায়; বা অন্য কথায়/ নৈঃশব্দের আড়ালে চলে যায়। এই গুরুতর অসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও উপচে পড়ে। 'বিজ্ঞানপ্রেমী' হিসেবে আমাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘা/আত্মতুষ্টি বোধ করা বা আত্মঘোষণাকারী মহলের একটা বড় অংশের দাবী করা 'বিজ্ঞান-মনস্কতা' তথা 'বিজ্ঞানচেতনা' 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের চরিত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সব ধারণায় ভরে

থাকে, যে ব্যাপারে আত্ম-সচেতনতার জন্ম ও বৃদ্ধি খুবই কাম্য। ভিত্তি-স্বরূপ 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের অর্থাৎ 'প্রাথমিক অর্ন্তদৃষ্টি'র অবদানকারীদের নানা রচনার সাথে ও তাঁদের রচনার উপর ভিত্তি করে লেখা অন্য ব্যাখ্যাতাদের রচনার সাথে ব্যাপকতর পরিচিতি ও প্রাতিষ্ঠানিক 'বিজ্ঞানশিক্ষার' জগতেও সেগুলিকে প্রাসঙ্গিক ভাবে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করা এ ব্যাপারে বর্তমান অবস্থার কাম্য গুণগত পরিবর্তন আনতে বা তার সূচনা করতে সহায়তা করবে বলে মনে হয়।

('বৈজ্ঞানিক' জ্ঞান বা অর্ন্তদৃষ্টির চরিত্র সম্পর্কিত উপরে উপস্থাপিত নানা দিকের উপর এই লেখকেরই অনেক বিস্তৃততর আলোচনা এই বইটিতে পাওয়া যেতে পারেঃ THE FORGOTTEN MESSAGES FROM THE PIONEERS OF 'SCIENCE' VS. INSTITUTIONAL 'SCIENCE'-EDUCATION & 'SCIENTIFIC' SOCIAL ACTIVISM by Subas Chandra Ganguly (Published by Rupali, 206 Bidhan Sarani, Kolkata-6, Mobile : +91 9432062928/8479912362]

---

1 360 খৃঃপূর্বাব্দের সুপরিচিত এক জন গ্রীস দেশীয় চিন্তাবিদ তাঁর 'রিপাবলিক' নামক বইয়ে 7নং পরিচ্ছেদে তাঁদেরই সমসাময়িক সক্রেটিস ও গ্লাউকন নামের আর এক জনের মধ্যে কাল্পনিক এক সংলাপের মধ্য দিয়ে বাস্তবের প্রকৃত রূপ চেনা প্রসঙ্গে যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা সংক্ষেপে এই রকমঃ প্ল্যাটোর কাল্পনিক সংলাপে সক্রেটিস এমন একটা দৃশ্য বর্ণনা করে শুরু করেছেন, যেখানে মানুষ যাকে বাস্তব বলে ধরে নিচ্ছে সেটা অলীক। তিনি গ্লাউকনকে এমন একটা গুহা কল্পনা করতে বলছেন, যেখানে শৈশব থেকেই শেকলে আটকে ও অচল করে বন্দীদের রাখা হয়। তাদের পা'গুলো শুধু (হাত কিন্তু নয়) এক জায়গায় আটকে রাখা হয় না, তাদের ঘাড়ও আটকে রাখা হয়, যাতে তারা তাদের সামনের এক দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়। বন্দীদের পিছনে প্রচন্ডভাবে আগুন জ্বলছে এবং আগুন ও বন্দীদের মাঝখানে একটা উঁচু হাঁটার পথ রয়েছে। আর সেই পথের উপর দিয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে লোকজন হেঁটে চলেছে। ... বন্দীরা উঁচু হাঁটার পথটা বা পথিকদের দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু লোকদের ছায়া দেখছে, এটা না জেনেই যে এগুলো ছায়া। চলার পথ থেকে যে আওয়াজ উঠছে, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার প্রতিধ্বনিও উঠছে। সক্রেটিস বলছেন বন্দীরা ছায়াগুলোকেই আসল জিনিস ভাববে ও প্রতিধ্বনিকে আসল শব্দ ধরে নেবে। এগুলোকে আসল বাস্তবের প্রতিফলন ভাববে না। কারণ তারা চিরকাল এমনটাই দেখে বা শুনে এসেছে। পরে কোন ছায়া আসছে এটা যে কেউ সব চেয়ে ভাল অনুমান করতে পারবে তাকেই এমন এক জন হিসেবে প্রশংসা করবে, যে জগতের চরিত্র সব চেয়ে ভাল বুঝতে পারছে। এবং তাদের গোটা সমাজটাই দেওয়ালের উপর এই ছায়ার উপর নির্ভর করবে। সক্রেটিস তারপর ব্যাখ্যা করছেন যে দার্শনিক এমন একজন বন্দীর মত যে গুহা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে দেয়ালের উপর ছায়াগুলো একেবারেই আসল বাস্তব নয়। উপরের যে অনুভবের টুকরোতে প্ল্যাটোর এই উপমার উল্লেখ রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-তথা- দার্শনিকদের নিজেদের সম্পর্কে এমন কোন দাবী নেই। বরং তাঁরা নিজেদেরকে ওই গুহাবন্দী মানুষদের মতই মনে করছেন।

2 এখানে মনে রাখা দরকার যে বিষয় হিসেবে 'যুক্তিবিদ্যা' বা ইংরেজিতে থাকে Logic বলা হয় তার দুটি ভাগ আছে- আরোহী (Inductive) ও অবরোহী (Deductive)। আরোহী বলতে যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট/বিশেষ কিছু উদাহরণ থেকে সাধারণ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো। যেমন 100 জন মানুষকে নিরীক্ষণ করে দেখা গেল

তাদের পিছনে কোন লেজ নেই। তার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হল যে মানুষের লেজ থাকে না। অবরোহী বলতে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন 'মানুষের লেজ থাকে না' এই সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে এই বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে, কোন দেশের মানুষেরই কোন লেজ নেই। ইউক্লিডের জ্যামিতি'র 'স্বতঃসিদ্ধ'গুলি এসেছে যুক্তিবিদ্যার প্রথম ধরণের অর্থাৎ আরোহী যুক্তি থেকে আর আর তা থেকে উপপাদ্য/সম্পাদ্য ইত্যাদি বার করে আনা হয় দ্বিতীয় ধরণের অর্থাৎ অবরোহী যুক্তির পথে। 'বিজ্ঞান মনস্কতা'র সাথে 'যুক্তি' শব্দের যে প্রচলিত ব্যাপক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে তা দ্বিতীয়োক্ত (অবরোহী) ধরণের প্রথমোক্ত ধরণের ('আরোহী'- বিশেষ থেকে সাধারণ) নয়। এবং নিচেও উদ্ধৃত সমস্ত অনুভূতির টুকরোগুলিতে এই দ্বিতীয় অর্থাৎ 'অবরোহী' অর্থেই 'যুক্তি' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে।

ভিন্ন স্বাদের কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

♦ নিউক্লিয়ার বোমা নয় ♦ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা

♦ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা ♦ পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমান ♦ পরিবেশ

আইন-কানুন ♦ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ♦ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ ♦ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

♦ পরমাণু শক্তি নয়- বিকল্প শক্তিই ভরসা ♦ ভারতের আম আদমির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

♦ বিজ্ঞানে আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুকতার চর্চা

♦ বিজ্ঞানে আন্দোলন অথবা কুপমণ্ডুকতার চর্চা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রঃ স্মরণ ও নির্মাণ : রবীন্দ্র মজুমদার

পাওয়া যাবে দু'হাজার কুড়ির বইমেলায় বি-ও-বির টেবিলে

(লিটল ম্যাগ পাভেলিয়ান এ No. 106) ও অন্যত্র।

বি-ও-বি-তে আপনার মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য

ডাকযোগে এবং / অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6টা থেকে 8টা, 2/1এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা - 700 009

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশদ্রোহী ছিলেন!

রবীন মজুমদার
E-mail : rabin.majumder@gmail.com

ইতিহাস পুনর্নির্মাণের একটা ফর্মুলা পেয়েছি- 30 শতাংশ কঠিন তথ্যের সঙ্গে 50 শতাংশ জল্পনা-রটনা-কল্পনার তরল মিশ্রণ, 5 শতাংশ বায়ু মিশিয়ে আজব দেশের রাতের রোদে সেঁকে ঝাঁকিয়ে পোটেনটাইজ করা। অল্প কিছু উপাদানের (5 শতাংশ) কথা উহ্য রইল। ট্রেড-সিক্রেট। পাঠকরাই যাচাই করুন কেমন উতরোল।

এক

ভারতের মানুষ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে আমাদেরকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে। এ দেশের মানুষই তাই আমাদের দল ও সরকারকে সার্বিক অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। রাষ্ট্রিয় রাজনীতি, রাষ্ট্রিয় ভাষা, রাষ্ট্রিয় ধর্ম, রাষ্ট্রিক ইতিহাস ও জাতীয়তা পুনর্গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদেরই। অতীতের সমস্ত ভুল শুধরে নতুন ভারত নির্মাণ করব আমরাই। বহুত্বের গুণগান করতে করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়ের ভাষা, ধর্ম, ধর্মাচরণ সবকিছুকে হেয় করা হয়েছে। এবার আমরা আমাদের স্বকীয় জাতীয় অবস্থান নির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করব। ঐতিহাসিকতা, নাগরিকতা, বৈজ্ঞানিকতার নতুন জাতীয় ভাষ্য রচনা করব - যা একান্তভাবেই হিন্দুস্তানের। অবদমিত প্রকৃত হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটবে, মেকী হিন্দুত্বকে হটিয়ে। বিশ্বে তার স্থান হবে অনন্য। আমাদের অতীত গৌরবময়। অদুর ভবিষ্যতে আমরা আমাদের হতগৌরব পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করব।

অতীতকেও আমাদের পুনর্নির্মাণ করতে হবে। বিজ্ঞান ও তার ইতিহাসও বাদ যাবে না। বিজ্ঞানেও আমরাই ছিলাম বিশ্বশ্রেষ্ঠ, অগ্রণী। বিশ্ব-শাসন করা বহু বহু বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কার - যা পশ্চিমী আধুনিক বিজ্ঞান বলে বলা হয়, সেসবের অধিকাংশই প্রাচীন ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। পশ্চিমী বিজ্ঞান আজও যার থই পায়নি বা হদিস জানে না, তেমন অনেক কিছুরই নথিভুক্ত তথ্যাদি আছে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও পুঁথিতে। নিজ ধর্মকে অবজ্ঞা, এমনকি অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই মূল্যবান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্যকেও হারিয়ে ফেলতে বসেছিলাম। আমাদের গবেষকরা সেসব উদ্ধারে নেমে পড়েছেন, নেতা মন্ত্রীরা তার কিছু কিছু বলছেন। বিজ্ঞানীরাও একে একে এগিয়ে আসছেন।

অধার্মিকতাই অনেক সময় মানুষের অনেক দুর্দশার মূল। তাই তারা বুঝতে পারে না যে ক্যানসারের মত মারণব্যাধি মানুষের পাপেরই শাস্তি। ডারউইনের বিবর্তনতত্ব আজগুবি- কেউ কি বানরকে মানুষ হতে দেখেছে? অথবা, আছে কি তেমন কোন মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ? পশ্চিমী বিজ্ঞান আজও জানেনা যে গরুই একমাত্র প্রাণী যে প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করে আবার নিঃশ্বাসে অক্সিজেনই ছেড়ে দেয়। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-কীর্তির হদিস রাখি না বলেই আমরা জানি না দেশী গরুর দুধের রং হলদেটে কারণ তাতে সোনা আছে। একমাত্র এদেশীয় গাভীর দুধেই সোনা পাওয়া সম্ভব কারণ অন্য কোন দেশের গাভীর পিঠে কুঁজ থাকে না। ঐ কুঁজে সূর্যের আলো পড়লে সোনা তৈরী হয়।

আমাদেরই প্রাচীন মন্ত্রে নিহিত আছে নিউটনের গতিসূত্রের সাংকেতিক বর্ণনা। নিউটনের হাজার বছর আগেই দ্বিতীয় ব্রহ্মগুপ্ত মহাকর্ষ-সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

মহাভারতের মহারথী কর্ণের জন্ম মাতৃগর্ভে হয় নি; অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয়েছিল জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে।

গণেশের শুন্ডযুক্ত হস্তিমুন্ড যে প্লাস্টিক সার্জেনেরই কাজ তাও কি বলার অপেক্ষা রাখে? খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই কণাদ নিউক্লিয়ার পরীক্ষা সংঘটিত করেছিলেন। রামায়ণের পুষ্পক রথ তো বিমানই। রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় বিমানের প্রথম আবিষ্কারক নন। মহাভারতের সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে বসেও অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যে যুদ্ধের বিশদ ধারাভাষ্য শোনাতেন, সে তো ইন্টারনেট প্রযুক্তিরই দৌলতে। কম্পিউটার লজিকের জন্মও ভারতে। নব্য ন্যায় দর্শনে বিধৃত গাণিতিক যুক্তিই কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভিত্তি। বেতার যোগাযোগের হদিস আছে বেদান্ত দর্শনে। 'চেতনার' গবেষণায় পশ্চিম খাবি খেয়ে চলেছে, অথচ চেতনা'র শেষ কথা বলা আছে বেদান্ত দর্শনেই।

বেদাদি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যের কথা যারা জানেনা তারা হয়তো বিজ্ঞ নয়। কিন্তু দেশের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু যারা অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে, জেনেও মানে না, গর্ব করতে পারে না তারা দেশের শত্রুই। তাদেরই অনেকে ভারতীয় ইতিহাসের ভুল ও অভারতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছে। ভুল বুঝিয়ে দেশবাসীকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করেছে। তারা দেশদ্রোহী ছাড়া আর কি?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেরকমই এক বিজ্ঞানী, যাঁকে বিপথগামী একাংশ ভারতীয় আজও-তাঁর মৃত্যুর পঁচাত্তর বছর পরও-মহাগুরুর আসনে বসিয়ে পূজো করে চলেছে।

শুধু প্রফুল্লচন্দ্র নন অবশ্য, তথাকথিত 'বেঙ্গল রেনেশাঁ'র অনেক কুশিলবই - যাঁদের পথিকৃৎ-এর সম্মান দেয়া হয়, ভারতের জাতীয়তাবোধ নির্মাণে স্বাধীনতা অর্জনে ও আধুনিকতায় উত্তরণে যাঁদের নাকি বিরাট মহৎ অবদান, তাঁদের অনেকেই একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্রই শুধু প্রাচীনভারতের বিজ্ঞানের গৌরবের হদিস জেনেও মুখ ফিরিয়েছিলেন। দেশকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে হিন্দুদের অসামান্য অর্জনের উদ্ঘাটনে নেমে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেও তিনি বিভ্রান্ত হন এবং বিভ্রান্তি ছড়ান। তাঁকে নতুন করে চিনে নেবার দরকার আছে। তা না হলে ভারতীয় বিজ্ঞানকে তার হেটমুন্ড উর্দ্ধপদ অবস্থা থেকে উলটিয়ে সোজাভাবে মাটিতে পা রেখে দাঁড় করানো যাবে না।

দুই

নিতান্ত শৈশবেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বাবা এবং তাঁর লাইব্রেরীর বই পত্র পত্রিকার দৌলতে উদারনৈতিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি ভাইরাসে আক্রান্ত হন এবং ভারতীয় উপনিবেশের শাসক ইংরেজ বিরোধী কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতি-অনুরাগী মানসিকতায় নিষিক্ত হন। এখনকার বাংলাদেশের খুলনার পল্লীগ্রাম থেকে পড়াশোনার জন্য বালক প্রফুল্ল কলকাতায় এসে প্রথম প্রথম তেমন খাপ খাওয়াতে পারেন নি। একে বাঙাল, কলকাতার 'ভদ্রলোক' মহলের আদবকায়দা তাঁর জানা ছিল না। তায় পেটের রোগ তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। আজীবন সমস্ত বিষয়েই তিনি যে দোটানায় দুলেছেন, সে এই কারণেই। কলকাতায় তখন ব্রাহ্মদের বেশ রমরমা। প্রফুল্লচন্দ্র প্রভাবশালী ব্রাহ্মদের মধ্যেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন এবং সহজেই তাঁদের খপ্পরে পড়লেন। ব্রাহ্মরা তো হিন্দুধর্মের সংস্কার করে নতুন এক একেশ্বরবাদী ধর্ম-ব্রাহ্ম-ধর্মের -প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রাহ্মদের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল সতীপ্রথা, বহুবিবাহ, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি সনাতন ধর্মানুসারী সামাজিক প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো এবং নারীশিক্ষার প্রবর্তন করা। সুখী গৃহকোণ থেকে মেয়েদের টেনে বের করে নব্য ইংরাজী শিক্ষার স্কুলে যুতে দেওয়া তাঁদের আন্দোলনের অঙ্গ। স্বভাবতই, কিছু ইংরেজ সাহেবও উল্লসিত হয়ে তাদের সহযোগী হয়েছিল। এঁদের ভাবে ও কাজে অনপ্রাণিত প্রফুল্লচন্দ্র পরে বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি পেয়েও ব্রাহ্ম-মতাদর্শে অবদান রাখার প্রয়াস পান। ব্রাহ্মদের মতই তিনি চাইতেন সমাজকে হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত

'ক্ষতিকারক ও অচল' কুপ্রথাগুলি থেকে মুক্ত করা ও আধুনিক ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এদেশে ব্রিটিশদের উপস্থিতিকে তিনি ভারতের পক্ষে মোটের উপর উপকারী বলেই গণ্য করতেন, মনে করতেন এর ফলে ভারত তার কুলীন শ্রেষ্ঠত্বের কুয়ো থেকে বেরিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শিখবে।

প্রফুল্লচন্দ্র একজন দক্ষ কুশলী এবং ছাত্রবৎসল শিক্ষক ছিলেন, সবাই বলেন, বলেই চলেন। কিন্তু তিনি এবং আরও অনেকে মিলে- ইংরেজরা যা চেয়েছিল, টোল চতুষ্পাঠীর দেশীয় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাটি ধ্বংস করা - সেই কাজেই মদত দিয়েছেন। রামমোহন বিদ্যাসাগরেরা যে ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন তাকেই পূর্ণতা দিতে ও বিস্তৃত করতে নেমে পড়েছিলেন। আমাদের পূণ্য মাতৃভূমিতে ইংরেজী শিক্ষার ধ্বজা উড়িয়েছিলেন, দেশীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অকেজো ও অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছিলেন। শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' সভাপতি হিসেবে তিনি বিজ্ঞান-কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে তৎপর ছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে।

ভারতীয় উপমহাদেশে 'আধুনিক' রসায়ন শিক্ষা চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী জনকের সম্মান দেওয়া হয় প্রফুল্লচন্দ্রকে। কিন্তু আমরা কি ভাবব না যে, যে ইংল্যান্ডের বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের বিকাশের ইতিহাসের কোন মিলই নেই, সেই ক্ষেত্রে ইংলন্ডের আদলে গড়ে তোলা এইসব বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার কেন্দ্র আখেরে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? প্রফুল্লচন্দ্র এবং প্রথম জীবনের জগদীশচন্দ্রই এদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে - গ্যালিলিও নিউটনের বিজ্ঞানকে-গৌরবান্বিত করার প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। একসময় জগদীশচন্দ্র তা উপলব্ধি করে থেমেছিলেন, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র সেখানেই না থেমে আমাদের গৌরবময় বিজ্ঞানের অতীতকে শুধু কালিমালিপ্তই করলেন না, আরও এগিয়ে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের ধাঁচাটিকে এদেশের মানুষের জীবনে চালকের আসনে বসাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

তিন।।

প্রফুল্লচন্দ্রের অনেক দুষ্কর্মের মধ্যে মাত্র কয়েকটি একটু বিশদ করলেই তাঁর আসল স্বরূপটি পরিষ্কার হবে।

প্রথমে বলা যাক তাঁর লেখা 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, 1902 এবং 1909)-বইএর কথা। প্রথম খণ্ডটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমে এটি প্রশংসার সঙ্গে আলোচিত হয় এবং বিজ্ঞানের বিশ্ব-ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের শূণ্যতা পূরণ করার মত অবদান বলে বরণ করা হয়। আমরাও সেই সুরেই সুর মিলিয়ে তাঁর জয়গান গেয়েছি। কিন্তু সত্যিই কি বইটি নিয়ে আমাদের শ্লাঘার কোন কারণ ছিল? এই বইয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বেদ, শঙ্করাচার্য, মনু এবং পুরোহিত শ্রেণীকে কলঙ্কিতই শুধু করেননি, ভারতে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অবক্ষয় ও মৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকেই প্রধানত দায়ী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁর কথাতেই সেটা অনুধাবন করা সবচেয়ে ভালো হবে ঃ

> ''বৈদিক যুগে ঋষি ও পুরোহিতগণ নিজেদের জন্য কোন স্বতন্ত্র জাতি নির্দেশ করেন নাই বরং স্ব স্ব রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিতেন... কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় অথবা বিতাড়ণের পর অবস্থার পরিবর্তন হইল। ব্রাহ্মণরা নূতন করিয়া নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন... জাতিভেদ প্রথা নূতন করিয়া আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। মনু পরবর্তী পুরাণকারদের প্রধান প্রবণতা ছিল পুরোহিত শ্রেণীকে গৌরবান্বিত করার দিকে। পুরোহিত শ্রেণী অতিশয় উদ্ধত ও আপত্তিজনক বোলচাল দিতে লাগিল। সুশ্রুতের মত ছিল শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যাতিরেকে শল্যবিদ্যা শিক্ষা করা যায় না; তিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের

উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কিন্তু মনু এসকল মানিতে রাজী নহেন। তিনি বলিতেন মৃতদেহ স্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ কলুষিত হইবে। তাই আমরা লক্ষ্য করি, কবি বাগভট্ট এর পরবর্ত্তী কাল হইতে শল্য-অস্ত্র ব্যবহার করার পথে বাধা আসিতে থাকে এবং শারীর সংস্থানবিদ্যা এবং শল্যবিদ্যার চর্চা লোপ পাইতে থাকে। কার্যত হিন্দুরা এসকল বিদ্যা বিস্মৃত হয়। এই প্রকারে কামারশালে ঘর্মনিঃসরণ করাও মর্যাদাহানিকর বলিয়া গণ্য হইল... করণকৌশলের চর্চা নিম্নবর্গের জন্য নির্দিষ্ট হইল। বৃত্তিগুলি হইয়া উঠিল বংশানুক্রমিক। ইহার ফলে নির্মাণে সূক্ষ্মতা ও ব্যবহারচাতুর্যের উন্নতি হইল সত্য, কিন্তু ইহার জন্য যে মূল্য দিতে হইল তাহা অত্যধিক। সমাজের মননশীল অংশের সঙ্গে করণকৌশলের চর্চাকারী অংশের সক্রিয় কোন যোগ রহিল না। কাজেই বিবিধ ব্যাপার কেমন করিয়া এবং কেন ঘটে, কার্য এবং কারণের সমন্বয় কি করিয়া সাধন করা যায় - সে সকলের বোধ, এক কথায় অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। ভারতবর্ষ তখনকার মত পরীক্ষানির্ভর ও বিশেষ ঘটনা হইতে সামান্য সিদ্ধান্তমূলক **(inductive)** বিজ্ঞানকে বিদায় দিল। ভারতের মাটি একজন বয়েল, একজন দেকার্তে বা একজন নিউটনের জন্ম দেওয়ার পক্ষে মানসিকভাবে অক্ষম হইয়া রহিল। এদেশের নাম বিশ্বের বিজ্ঞানমানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল..."

এই বইতেই তিনি আরও লিখেছিলেন, "শঙ্কর কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত বেদান্তদর্শন এই শিক্ষা দেয় যে বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নাই। ভৌতবিজ্ঞানের চর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মূলে এই দর্শনও বহুলাংশে দায়ী।"

এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্র 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক একখানি দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন। অনতিবিলম্বে তার ইংরেজী রূপও (The Bengali Brain and its Misuse) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনি আরও খোলামেলা ও স্পষ্ট এবং রুঢ় ঃ

"সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সমগ্র ভারতবাসী অহিফেনসেবীর ন্যায় জড় নিস্পদ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে।... যখন যে জাতি এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পুরাতনের প্রতি একটা অযথা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করে, তখন শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়-পথ দেখিবার আলোকের অভাবে ঋষিবাক্য বর্তিকাস্বরূপ গৃহীত হয়। আমাদেরও তাহাই ঘটিল।... এই দুর্দিনে দুই শ্রেণীর লোকের আধিপত্য বিস্তার হইল। এক শ্রেণী শাস্ত্রকার, অপর শ্রেণী শাস্ত্রব্যাখ্যাতা।... সমাজ যখন এই অবস্থায় পতিত হয়... নিজের উদ্যমশীলতা ও নিজের কৃতকর্মতার উপর ঘোর অবিশ্বাস জন্মে। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, আধিদৈবিক ও অধিভৌতিক ব্যাপারসমূহের উপর ততই অচল বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়ায়।... সমগ্র ইউরোপও মধ্যযুগে **(Middle Ages)** এই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।...

"...মানুষের চরম অবনতি তখনই সূচিত হয় যখন তাহার চরিত্র হইতে সম্ভ্রমের ও গুণগ্রাহিতার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়। হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ। হিন্দু ভিন্ন সকল জাতি ম্লেচ্ছ ও বর্বর, তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই, এই প্রকার সংস্কারসকল যেদিন আমাদের জাতীর চরিত্রে প্রবল অধিকার স্থাপন করিল, সেইদিন হইতে আমাদের উন্নতির মার্গ কন্টকিত হইল। সেই দিন হইতে হিন্দু জাতি

কূপমন্ডুক হইল।...''

'এ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' যে ইউরোপে হাততালি পাবে, প্রশংসিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কারণ, তিনিই তো বলছেন, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের অবসানে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 'অন্ধকার যুগ' ঘনিয়ে এল এবং 'বৌদ্ধিক খর্বতা ও স্থবিরতার ভূমিতে' পরিণত হল।

কুখ্যাত যে চার্বাক দর্শন, এদেশে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছিল, বেদের কর্তৃত্ব-অস্বীকারে এবং অনুসন্ধান প্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তার মধ্যেই তিনি রসদ খুঁজে পেলেন!

''ভারত যে শাস্ত্রবাদগ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল এমন নহে। প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি যথেষ্টই বলবতী ছিল... স্বাধীন চিন্তা কতদূর উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা চার্বাক দর্শন আলোচনা করিলেই বুঝা যায়...

''চার্বাকমুনি শ্রুতিও অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'কতিপয় প্রতারক ধূর্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ-নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করতঃ সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে... মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুত কোন ফলোপধায়ক নহে'।''

'হিন্দু' শব্দটির ব্যবহারে প্রফুল্লচন্দ্র চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন। বই-এর নামে 'হিন্দু' শব্দে তিনি যেন বোঝাতে চান যে তাঁর বই হিন্দুদের গৌরবময় বিজ্ঞান ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবে রসায়নে অবদান-এর ইতিহাস তুলে ধরেছে। বাস্তবে তিনি কিন্তু হিন্দু ও হিন্দুত্বের অবমাননাই করেছেন। পাঠককে আবার বোঝাবারও প্রয়াস পান যে 'হিন্দু' বলতে তিনি 'ভারত'ই বোঝাতে চেয়েছেন। এই বিভ্রান্তির অবসান অবশেষে হল 'এ হিস্ট্রি...'র পরবর্তী সংস্করণে, তাঁর মৃত্যুর বারো বছর পরে। তাঁরই স্নেহধন্য ছাত্র, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় 'হিস্ট্রি অফ কেমিস্ট্রি ইন এনশিয়েন্ট অ্যাণ্ড মেডিয়েভেল ইন্ডিয়া' নামের পরিমার্জিত সংস্করণে 'অন্তর্ভুক্তি ঘটল'-'এ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি'র। প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্রেরই তৈরী ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি। অধ্যাপক রায় এবং কেমিক্যাল সোসাইটি ধন্যবাদার্হ। বই-এর নাম থেকে 'হিন্দু' শব্দের অপসারণই শুধু ঘটল না, 'হিন্দু' এবং হিন্দুত্বের অবমাননাকর ভাষ্যও (আগেই যা উল্লেখ করা হয়েছে) উপযুক্তভাবে *সম্পাদিত* হল এই সংস্করণে। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও কারিগরীর গবেষক ও লেখক দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (এবং তাঁরই মত অন্যরা যাঁরা ভালোরকম মগজ ধোলাই-এর শিকার) অবশ্য এই দ্বিতীয় সংস্করণটিতে প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটেছে বলে ধিক্কার দেন। এরা চিরকাল এমনটাই করেন।

চার।।

প্রফুল্লচন্দ্রের আরও একটি, এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো, অপকর্ম হল- 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (BCPW)' তৈরী করা। শিক্ষক হয়েও তিনি ব্যবসায় নামলেন। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'কে তিনি একটা স্বদেশী শিল্প হিসেবে প্রচার করলেন এবং জীবদ্দশায় 'স্বদেশী' সেন্টিমেন্টের সদ্ব্যবহার করে বেঙ্গল কেমিক্যাল ভালই বাণিজ্য করেছিল। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের নিজস্ব যে দেশীয় শিল্প-ভিত্তি, সেই হস্তশিল্প কুটির শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংসাবশেষের উপরই দাঁড়িয়ে গেল বেঙ্গল কেমিক্যালের মত পশ্চিমী যন্ত্রশিল্প। আমাদের গ্রাম কেন্দ্রিক বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ তার সামাজিক উৎপাদন ও ভোগ এমনকি রপ্তানিতে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, বেঙ্গল কেমিক্যাল তার জায়গায় মুলধন ও যন্ত্রনির্ভর কেন্দ্রীভূত, মুনাফা-চালিত বৃহৎ ও ভারী শিল্পের বীজ-পুঁতল। পরিবেশের পক্ষেও এরা বিপজ্জনক। তাঁর মৃত্যুর পর BCPW আর তাল রেখে উঠতে পারলনা

এবং ক্রমাগত প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়তে লাগল। অন্য দেশে যা ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত, তাকেও আমরা আমাদের দেশের উপযোগীভাবে নতুন করে পুনরাবিষ্কার করবো- এই গোঁড়ামি থাকলে কি চলে? অথচ প্রফুল্লচন্দ্র, যিনি আবার শিক্ষাবিদও, এটাকেই তাঁর শিল্পভাবনার ভিত্তি করেছিলেন। ফল যা হবার তাই হল, BCPW রুগ্ন হয়ে পড়ল। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার, এটা বুঝেও বুঝতে চায়নি। BCPW-কে অধিগ্রহণ করল, নতুন নাম হল তার - বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (BCPL)। প্রচুর অর্থের অপচয় ঘটল। কিন্তু BCPL কে সরকারের আর টানা সম্ভব হচ্ছিল না। উচিতও নয়। আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, তাই, যথার্থভাবেই BCPL-এর নাম বিক্রী ও বিলগ্নীকরণের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে।

প্রতিষ্ঠাতার স্ববিরোধের প্রতীক BCPL। পশ্চিমী ভাবাদর্শে, বিশেষ করে ব্রিটিশ শিল্পের আদলে BCPL গড়ে তুললেও, প্রফুল্লচন্দ্র হয়ে পড়লেন চরকা-প্রেমী এবং গান্ধী অনুরাগী! মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা- প্রত্যাগত একজন ভারতীয় আইনজীবি মাত্র, তখন প্রভুত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার অধিকারী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ই অ্যালবার্ট হলে গান্ধীর প্রথম পাবলিক বক্তৃতার আয়োজন করেন। অথচ পরে উল্টে গেল সম্পর্কটা। গান্ধীর বৃহৎ শিল্পের প্রতি বিরূপতা প্রবাদস্বরূপ। স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত!

পাঁচ।।

প্রফুল্লচন্দ্র যতটা বিজ্ঞানী ছিলেন, তার চেয়ে বোধহয় বেশীই ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ভুলক্রমে অমি একজন রাসায়নিক'। তাঁর বৃটিশ-বিরোধিতা ছিল একটা হিসেবী সম্পর্ক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য লিখেছিলেন 'ইন্ডিয়া বিফোর অ্যাণ্ড আফটার দ্য মিউটিনি' বা সিপাহী যুদ্ধের আগের ও পরের ভারত'। এতে তিনি তীব্রভাবে বৃটিশদের সমালোচনা করেন ভারতে অপশাসন ও শোষণের জন্য, কিন্তু এই প্রবন্ধে হিন্দু এবং হিন্দুত্ব সম্পর্কেও তাঁর বিরূপ মনোভাব তুলে ধরতে ভোলেননি। চতুর বৃটিশ তখন থেকেই তাঁর উপর আজীবন নজর রেখেছিল, কিন্তু কোনদিনই তাঁকে অ্যারেস্ট করেনি বা নিয়ন্ত্রণ করেনি। তিনি সশস্ত্র স্বদেশীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য পর্যন্ত করেন জেনেও, বৃটিশ শাসক তাঁকে রসেবসে রাখতে কসুর করেনি। তাঁকে কম্প্যানিয়ন অফ দি ইম্পিরিয়াল এম্পায়ার বা CIE এবং নাইটহুড দিয়েও সম্মানিত করেছিল। কারণ, ব্রিটিশরা জানত যে তিনি উপনিবেশের সংহতি আনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। ব্রিটিশদের দেওয়া এইসব 'অলঙ্কার' নিয়ে তিনি পরিহাস করলেও রবীন্দ্রনাথের মত নাইটহুড পরিত্যাগেরও সাহস দেখান নি। শাসকের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রও নরমে গরমে পরিপূরক ভূমিকায়। 'নাইট' উপাধি পাবার খবর যেদিন পেলেন, সেদিন বিকেলেই তিনি রবাহুত ছুটলেন টাউন হলে। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে শাসককে একহাত নিয়ে এখনকার আরবান নকশালদের ঢং-এ একটি গরম বক্তৃতা দিলেন। গর্জনও করলেন- 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ নয়।' এসবই যে ছদ্ম বিরোধিতা তা ধরা পড়ে যায়, যখন ঐ একই ব্যক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি থেকে আমাদানী বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়া ব্রিটিশদের সাহায্যার্থে নাইট্রিক অ্যাসিড আর অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ করেন।

প্রায়-নাস্তিক প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মের মধ্যে প্রশংসনীয় দিক দেখতে পেতেন। 'বাঙালীর মস্তিষ্কে...' তিনি লিখেছেন-

"...বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভারতের সর্বত্র ঘোষিত হইল। তাহার ফলে জ্ঞানোন্নতির পথ

সর্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত হওয়ায়, সর্বশাস্ত্রের সম্যক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষত বৌদ্ধগণ রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। একা নাগর্জ্জুনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে।...

'হিন্দু' বলিলে মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের প্রাধান্য বুঝি মাত্র। এই গন্ডীর ভিতর ফোঁটা-তিলক কাটিয়া শাস্ত্রের ভেল্কী যিনি যত খাটাইবেন, তিনিই তত হিন্দু। সাধারণের নিকট জ্ঞানদ্বার রুদ্ধ।..."

বক্তৃতায় লেখায় নানাভাবে বার বার ফুটে উঠেছে তাঁর ইসলাম প্রীতি। হিন্দুধর্মের প্রতি আর একটু কালি ছেটানোর ন্যুনতম সুযোগও তিনি ছাড়তেন না। একটি উদাহরণ ঃ

"...শাস্ত্রের কঠোর তাড়নায় জাত্যাভিমান, কুলমর্যাদা ইত্যাদির অসহনীয় কশাঘাতে উন্মত্ত হইয়া... ভালবাসা... সহানুভূতির অভাবে, যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক সমাজের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, তাহারা উচ্চশ্রেণীর প্রতি ক্রমেই বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে শিখিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিল।..."

বিবেকানন্দকে ঢাল বানিয়েও হিন্দুধর্মকে আক্রমণে শান দিয়েছেন তিনি, "স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, 'যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দেখে না, যে ধর্ম মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম?"

ছয়।।

সংক্ষেপে বলা যাক- ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে লক্ষ্য- উপনিবেশে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব কায়েম ও সংহত করা- প্রফুল্লচন্দ্র সেই কাজেই ব্রিটিশকে সাহায্য করেছেন এবং সেই সূত্রে দেশীয় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলির ধ্বংস এবং দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের ভিতটাকে আলগা করার কাজে মদত দিয়েছিলেন। এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ যে ধর্মকে অবলম্বন করে বেঁচে থেকেছে, কয়েক সহস্র বছর ধরে রসদ পেয়েছে, তাকেও হেয় করেছেন তিনি। তিনি সেই শহুরে ভদ্রলোকদেরই একজন প্রতিনিধি, শিল্প বিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্যের আলোর ঝলকানিতে যাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এবং বৃথাই যাঁরা প্রবল উদ্যমে আমাদের স্থায়ী ও পোক্ত যৌথ সামাজিক ভিতকে অস্বীকার করার ও ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন। 'দেশদ্রোহী' তকমাই তাঁর প্রাপ্য!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ সর্বশ্রী সমর বাগচি, আশীষ লাহিড়ী, পার্থ রায়, সমীর সাহা, সুভাষ গাঙ্গুলী, সুদীপ্ত সরস্বতী ও শিবপ্রসাদ নিয়োগী।

এগারো বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে

দুর্বার ভাবনা

12/5, নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা - 700 006, ফোন ঃ 033 2543 7560 / 7451

ই-মেল ঃ tarunbasu2006@gmail.com, URL : www.durbar.org

ভারতের শিল্পায়নের রূপরেখা ও সীমাবদ্ধতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নীতি

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

E-mail : kausik56@gmail.com

রেনেসাঁস যে মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার সোপান খুলে দিল, সেই পথে পূর্বতন আগুন ও চাকা আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় এলো বাষ্পশক্তি, যার থেকে ইওরোপে শিল্পবিপ্লব। ভারতে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে বৃহৎ শিল্প না থাকলেও বিশ্বে তার বিশিষ্ট স্থান ছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে এলো খন্ডিত ও অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, মূলত যুদ্ধের তাগিদে। স্বাধীন ভারতে পর্বে পর্বে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিমুখ ও পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির গতিপথে বদল ঘটেছে-যার প্রতিফলন ঘটেছে শিল্পায়নে। কিন্তু তার ফলে আদতে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের কতটা সিদ্ধ হলো? না হয়ে থাকলে সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কি এক বিকল্প রূপরেখা, দেশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয়ে, উদ্ভাবন করা সম্ভব? এই প্রশ্নের যথাযথ সমাধানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের বর্তমান অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

1. রেনেসাঁস ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

রেনেসাঁসের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে দর্শন ও ভাবজগতে বিপ্লব ঘটে তার ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানমনস্কতার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণার প্রসার। এসবেরই পরিণতি শিল্পবিপ্লব-যা পাশ্চাত্য সমাজের বৈশিষ্ট্যকে অপরিবর্তনীয়ভাবে পরিবর্তন করে ফেলে। তবে সেই সুখও অবিমিশ্র নয়, কারণ চিন্তানায়ক, বিজ্ঞানী, গবেষক ও সমাজতাত্ত্বিকবৃন্দ অনেক আগেই প্রকৃতির (Nature) থেকে যথেচ্ছ সম্পদ আহরণের পরিণতিতে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন-সে প্রশ্ন আপাতত থাক। কিন্তু সে শিল্প-বিপ্লব কার্যত বিশ্বের ইতিহাসকে নতুন করে লিখল বলা চলে এবং যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিশ্বযুদ্ধ বিষয়টিও জড়িত- সেই ধরনের শিল্পায়ন আদতে ভারতবর্ষে এসেছিল কিনা বা তার অভিঘাত তৎকালীন পরাধীন দেশে কতটা কিভাবে ঘটেছিল এটি রীতিমত এক গবেষণার বিষয়। এই প্রবন্ধে সেই পূর্ণাঙ্গ বা মৌলিক আলোচনার দাবি নেই, বরং নিবিড় পাঠের মাধ্যমে বিষয়টির বৃহৎ পরিধির সঙ্গে সুধী পাঠকের পরিচিতি ঘটানোর একটি প্রয়াস বলা যায়।

2. শিল্পায়ন কী-উদ্দেশ্য মূল্যায়নের মানদন্ড

কোনো জাতির সম্পদ ও উন্নতি নির্ভর করে শিল্পায়নের মাধ্যমে মানবিক ও বস্তুসম্পদের কার্যকরী সদ্ব্যবহারের ওপরে (Science Policy Resolution 1958)। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বিভিন্ন সরকার নানাভাবে চিন্তা করলেও, যে মূল বিষয়গুলিতে তারা সবাই আগ্রহী তা হলো- ক) জাতীর সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি, খ) দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ) আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের হ্রাস। ধরা হয় শিল্পায়ন এমন এক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটাবে- যার ফলে পরোক্ষভাবে ব্যাপক মানুষ উপকৃত হবে- এমন কি অন্য ক্ষেত্র গুলিতেও। যেমন, মানসিকতার বদল, দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্প-পরিচালকদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির প্রসার ইত্যাদি।

শিল্পায়নের লক্ষ্য ও পন্থা নিয়ে বিতর্ক আছে, সে বিষয়ে পরে আসা যাবে। শিল্পায়নের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতটা কি হলো- তার একটি মাপকাঠি ধরা হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু স্বাধীনতার প্রাক্কালে 14 আগস্ট 1947 ঘোষণা করেছিলেন - ভবিষ্যতে কাজের মধ্যে থাকবে - "দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগ দূরীকরণ এবং সুযোগের

বৈষম্যের অবসান।" এই মাপকাঠি দিয়ে শিল্পায়নের সাফল্যের মূল্যায়ন করা যায়।

3. প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় শিল্প ও পলাশীর যুদ্ধ

নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ঘটনাপ্রবাহের পরিণতিতে ইয়োরোপে আধুনিক বৃহৎ শিল্পের সূত্রপাত ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবিসম্বাদি প্রাধান্য ছিল। সারা বিশ্বের কর্মশালা হিসেবে এদেশ স্বীকৃত ছিল সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে। সে সময়ে ইংল্যান্ড-এ ভারতীয় তন্তুজাত পণ্যের চাহিদা ছিল অবিশ্বাস্য। ভারতীয় কাপড়কে ইংল্যান্ড-এ সে সময়কার ফ্যাশন-এর চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হত। পশম ও রেশম বস্তুর চাহিদা ছিল তুঙ্গে। এর ফলে ইংল্যান্ড ও ইউরোপ-এর একাংশে অবর্ণনীয় আর্থ-সামাজিক সংকট দেখা গেছিল।

ভারত-ইংল্যান্ড শিল্প-বাণিজ্যের ভারসাম্যে এই একমুখী প্রবণতার ফলে সে সময়ে *ইংল্যান্ডের সম্পদ ক্রমে এসে ভারতে জমা হতে থাকলো। এর পরিণতি দাঁড়ালো তৎকালীন মান অনুসারে-যা ভারতের পক্ষে "শিল্পায়ন", তাই ইংল্যান্ডের পক্ষে "শিল্প-নির্মূলকরণ"।* তবে এদেশের এই সুখের দিনের অবসান ঘটলো 1757 খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ জয় উপলক্ষে ইংল্যান্ডের আগ্রাসনের পরিণতিতে।

4. ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন

এই যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী শাসক তাদের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ অপব্যবহার শুরু করলো নির্লজ্জভাবে। ইংল্যান্ডের উৎপাদন-শিল্পের স্বার্থ-রক্ষার জন্য চাপ আসায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় শিল্পের ওপরে এমন প্রাণঘাতী আঘাত হানলো যে এদেশের শিল্প ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। সরাসরি বাণিজ্য- প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে, এমন এক অসম শর্তে (one way free trade) চুক্তি সম্পাদন করলো যে তার ফলে ভারতীয় শিল্পকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হলো। তার ওপর বৃটেনের কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির-শিল্পের পণ্য এক অসম যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ছিল।

ভারতীয় অর্থনীতিতে গ্রামীণ হস্তশিল্পের অবক্ষয় এবং আধুনিক শিল্পের মন্থর বিকাশ-যার অভিঘাত জমির ওপরে জনঘণত্বের চাপ বৃদ্ধি। *যেহেতু এধরনের গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগর ও হস্তশিল্পীরা কৃষিবহির্ভূত কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারেননি, জীবিকার জন্য- তাদের নির্ভরতা বাড়তে থাকে জমির ওপরে।* উপরিলিখিত সর্বনাশা শিল্পনীতির ফলে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষ তুচ্ছ দৈনন্দিন ভোগ্যসামগ্রী ব্লেড, সেলাই মেশিন, সূচ ইত্যাদি সবকিছুর জন্য বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ে।

5. স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা ও তার পূর্বসূরী

1944 সালের *বম্বে প্ল্যান*-এর রচয়িতা আটজন শিল্পপতির দূরদর্শিতা অভিনন্দযোগ্য যেখানে তাঁরা এই বুনিয়াদী শিল্পের অসামান্য গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর বিকাশের সুপারিশ করেছিলেন তাঁদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায়- "These industries are the basis on which the economic superstructure envisaged in the plan will have to be erected..."

লক্ষণীয় যে উল্লেখিত 1944 সালের "বম্বে প্ল্যান"-এরও আগে এমন পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরাধীন ভারতে নিজস্ব পরিকল্পনা সর্বপ্রথম পেশ করেন একজন বিখ্যাত প্রকৌশলী (Civil Engineer) স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া 1934 সালে তার একটি বইয়ের মাধ্যমে- "Planned Economy in India"। তার দূরদর্শিতার পাশাপাশি উল্লেখ্য ডঃ মহলানবিশের অনুরাগী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এ বিষয়ে গৌরবময় ভূমিকা- 1938 সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তারই

উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গড়ে ওঠে, তাকে ভারতীয় পরিকল্পনার সফল পথপ্রদর্শকের মর্যাদা দেয়া উচিত। সরকারী পর্যায়ে 1944 সালে ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ চালু করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তজ্জনিত অস্থিতিশীলতার ফলে তখন পরিকল্পনাকে উন্নয়নের সোপান হিসাবে গ্রহণের মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে নি। স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1956-61) মহনানবিশ মডেলটিই (ডঃ মহলানবিশ রুশ উন্নয়নের অনুপ্রেরণায় এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলটি 1953 সালে সৃষ্টি করেন) বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর মতাদর্শ, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা এটির পিছনে সদা সক্রিয় ছিল। এদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে সরকারী নীতির কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে প্রতিবেশী চীনদেশের কিছু অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। Fred Engst এর মতো তথ্যাভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের মতে- *এক সুসংহত, দেশজ, বহুমুখী অর্থনৈতিক ভিতই পুঁজিবাদী বিশ্বে চীনের পুনরাবির্ভাবের এবং উদীয়মান শিল্প-শক্তিতে পরিণত হওয়ার চাবিকাঠি। এটা না থাকলে, নয়া-উদারনীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ধ্বংস করে দেবে। ... এসব সম্ভব হলো যে কারণে, তার মোদ্দা বিষয় হচ্ছে- গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির (key sectors) উপর চিনের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল।*

বৈজ্ঞানিক গবেষণা

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাই হলো সমস্ত রকম শিল্প-সমৃদ্ধি ও আর্থিক বিকাশের প্রধান ভিত্তি: সারা বিশ্বে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী 150 বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সহায়তায় একদিকে পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি, অন্যদিকে মূল্যহ্রাস ও উৎপাদন সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ- এ সবই সম্ভব হচ্ছে। এই লক্ষ্যে স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পগত গবেষণায় টাটা গোষ্ঠী পোষিত Indian Institute of Science এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা ভাবা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক কালের তথা বিগত শতাব্দীর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো *গবেষণাকর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান। এমন কি 30-এর দশকে প্রবল আর্থিক মন্দা বাজারেও সেদেশে 1600 শিল্প-গবেষণাকেন্দ্র ছিলো- যেখানে 22000 এরও বেশি প্রশিক্ষিত গবেষক কর্মরত ছিলেন।* রাসায়নিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গবেষণায় 20 মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় 1937 সালে।

অর্থনৈতিক ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির ইচ্ছা থাকলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই এক্ষেত্রে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা প্রসারের বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে। 1940 সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে পণ্য-সঙ্কট ও দেশের সম্পদকে যুদ্ধে উপকরণ সরবারহে নিয়োগের তাগিদে শিল্প-গবেষণার (industrial research) প্রয়োজন বোধ করে। এর কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার হলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, বিশেষত দপ্তরের কর্তা স্যার এ. রামস্বামী মুদ্‌লিয়র। বোর্ড অফ সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর সৃষ্টি হয় 1940 সালে এবং এর অধিকর্তা হিসাবে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরকে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে এটিই CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং একেই নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

অভিজ্ঞ জনেরা হয়ত অবগত আছেন যে কয়েক দশক আগে পর্যন্ত কয়েকটি ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে কলকাতা ও শহরতলীতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য মিলেছিল- যেমন বেলেঘাটা অঞ্চলে কাচের তৈরী নানা সৌখিন পাত্র, বৌবাজার অঞ্চলে চশমা ও ক্যামেরার লেন্স তথা ophthalmic glass এর শিল্প

এবং এগুলির পৃষ্ঠপোষক ও উপদেশক হিসাবে সরকারি সংস্থা National Instruments ছিল। এছাড়া ভেষজ শিল্পে বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিকাল এগুলি থাকলেও সরকারি যথাযথ পরিকল্পনা, পৃষ্ঠপোষকতা ও গবেষণার অভাব এবং বহুজাতিক সংস্থার প্রবল বিপণন ইত্যাদির দাপটে এগুলি দিশাহারা, কেউ বা এখন রুগ্ন।

6. বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতির রূপান্তর: 1958 থেকে 2013- সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

1958 সালের 4 মার্চ সংসদে Science Resolution 1958 গৃহীত হয়-যার পূনর্মূল্যায়নের জন্য পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীদের বিস্তারিত অধিবেশন বসে 1963 সালে। সদ্য স্বাধীন দেশের নীতি নির্ধারকরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে এর রূপরেখা তৈরী করেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল-

1. বিশুদ্ধ ও ফলিত উভয় রকমের বিজ্ঞান-শিক্ষার ও বিজ্ঞান গবেষণার বিকাশ
2. বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীর এক বাহিনী তৈরী এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতার সদ্ব্যবহার।
3. এই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী বাহিনীর দ্রুত যথাযথ এমন ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, যাতে তা দেশের চাহিদা মেটাতে পারে।

1974 সালে National Committee on Science and Technology-র দ্বারা এক সর্বাত্মক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা রচিত হয়। এতে ক্ষেত্র-সমীক্ষার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারের অনেকগুলি ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়, যেমন- কৃষি, গোপালন, বস্ত্রশিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ, জল সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্য, কয়লা, খনিজ তেল, পারমানবিক ও বিকল্প শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমন্বিত নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা (Integrated River basin Development), লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি 24টি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষমাত্রা ও সময়সীমা স্থির করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন ও উৎসাহ দানের (incentive) ব্যবস্থা করা হয়। বাস্তবে এত বেশি ক্ষেত্র স্থির হয়েছিল যে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে রেষারেষি ইত্যাদি কারণে এটি শেষ পর্যন্ত রূপায়নের লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশ পিছিয়ে পড়ে। এটি বেশি উচ্ছাকাঙ্খী ছিল কিনা সেই প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেন।

1983 সালের জানুয়ারীতে ভারত সরকার Technology Policy Statement 1983 (TPS) বা জাতীয় কারিগরী নীতি 1983 ঘোষণা করে। এর রূপায়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই প্রযুক্তি নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করা (Absorption of Imported Technology)। এই নীতির লক্ষ্যের মধ্যে ছিল-উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, সমাজের পশ্চাদপদ অংশের প্রয়োজন মেটানো এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন।

এই নীতি (TPS) কৃষির উপরে, বিশেষত রুক্ষ মাটিতে চাষ জলসম্পদের সুষম ব্যবহার, তৈলবীজ, পানীয় জল, পুষ্টি সংক্রান্ত রোগ নির্মূলন, স্বল্পমূল্য আবাসন, পুনর্নবীকরণ-যোগ্য শক্তি এবং শিল্পায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ঘোষিত হয়- বিশেষত মূল্যযুক্ত পরিষেবা (value aded sevice) এবং স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলিতে। এই নীতির রূপায়নকালে ঘোষিত উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সত্তরের দশকে যেমন দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন অগ্রাধিকার পেত, তেমনটি আর ঘটছিল না, *বরং প্রযুক্তি আমদানির ঝোঁক ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।* এজন্য TPS 1983 নীতিকে 1988 সালে পুনর্মূল্যায়ন করে পথ নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু তাতেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হয় না। নতুন করে ঘোষিত

হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি 2003।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি 2003

- সরকারের এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলকে তুলে ধরা এবং এই ক্ষেত্রে গবেষণার (R & D) প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- অধিকন্তু এটি রচিত হয়েছে আর্থসামাজিক ক্ষেত্র ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা ক্ষেত্রকে সংযুক্তভাবে বিবেচনা করে- যাতে জাতীয় সংকটগুলিকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করা যায়। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে এক উদ্ভাবনা পরিকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবনা রচনা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন নীতি, 2013 [Science and Technology Innovation Policy (STI '13) 2013]

দ্রুত সুস্থিত (sustainable), সর্বতোমুখী (inclusive) উন্নয়নের লক্ষ্যে,

2020 সালের মধ্যে ভারতকে বিজ্ঞানে প্রথম 10 টি দেশের মধ্যে স্থানলাভের প্রয়াসে,

সর্বতোমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকান্ডের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবনের অগ্রাধিকারের সমন্বয় সাধন করে গবেষণায় বেসরকারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এক অতিকায় জাতীয় উদ্ভাবনা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘোষণা নিয়ে এল নবীকৃত নীতি।

7. ভারতে শিল্পায়নের মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন করা যেতে পারে নীচের চারটি স্বীকৃত মানদণ্ডগুলির সাহায্যে-

ক) জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি: 1960 থেকে 1980 সালে GNP (জাতীয় উৎপাদন) বৃদ্ধি ছিল 1.4%। 80র দশকে আর্থিক সংস্কারের প্রভাবে এটি বেড়ে হয় 3.25%। 1990-এর দশকে আরো মুক্ত বাণিজ্য নীতি গ্রহণের ফলে এই হার 1987 থেকে 1997 এর মধ্যে বেড়ে দাড়ায় 3.8%।

খ) দারিদ্র্য দূরীকরণ: Global Hunger Index বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বর্তমানে ভারতের অবস্থান 119টি দেশের মধ্যে 103 স্থানে (পাকিস্তান বাদে সব প্রতিবেশী দেশের পিছনে)- যেটি লজ্জার বিষয়। আজও 5 বছরের নীচের শিশুর 20% তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত। 1950-এর দশকে ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের হার কমছে বেশ ধীর গতিতে।

গ) আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের হ্রাস:

বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তা মূলত উদারিকরণের আগে। 1990-এর দশকে মুক্ত-বাণিজ্য নীতি গ্রহণের ফলে এই বৈষম্য আরো বেড়ে চলেছে।

শিক্ষা ঃ 1960 সাল থেকে 1977 সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার কমেছে মাত্র 11%, 1978 থেকে 1995 এর মধ্যে 25%।

স্বাস্থ্য ঃ গড় আয়ু একটি মানদন্ড ধরলে স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমেই এক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। 1960 থেকে 1980 সালের মধ্যে এটি গড়ে 43 বছর থেকে 52 বছর হয়েছে- যেটি 21% বৃদ্ধি। আবার 1980 সাল থেকে 1995 সালের মধ্যে এটি 62 বছরে পৌঁছেছে।

শিশুমৃত্যুর হারেও স্পষ্টতই উন্নতি হয়েছে। 1960 থেকে 1995 সালের সময়কালে শিশুমৃত্যুর হার কমে 25%। 1980 সাল থেকে 1995 সালের মধ্যে এই সূচকটির হ্রাস ঘটে 45%। এতদসত্বেও বিশ্বের অপুষ্ট শিশুদের অর্ধেক সংখ্যাক বাস করে ভারতবর্ষে।

বৈষম্য হ্রাস ঃ বৈষম্যের এক ঝলক দেখা যেতে পারে 'নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েল্‌থ' এবং 'সি.ই.ও ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার (2017) রিপোর্ট থেকে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ষষ্ঠ- তার ওপরে রয়েছে কেবল আমেরিকা, চীন, জার্মানী, জাপান এবং ইউ কে। কিন্তু লক্ষণীয় হলো- সম্পদ বৃদ্ধি হারের অনুপাতে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ। কোটিপতির সংখ্যায় ভারত বিশ্বে সপ্তম,

আর ''লক্ষ কোটির ধনীর'' সংখ্যায় বিশ্বে সপ্তম। এর বিপরীতে ''ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন'' (2017) থেকে জানা যায় বিশ্বের 200 কোটি মানুষের পেট ভরা খাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই দেশে দৈনিক কুড়ি টাকা আয়ের মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি।

আর্থিক বৈষম্য প্রকাশের অধুনা স্বীকৃত-সূচক হল GINI- যার মান 1.0 হলে বোঝায় চরম বৈষম্য, 0 হলে বৈষম্য মুক্ত। 1994 সাল পর্যন্ত এই সূচকের মানটি প্রায় স্থিতিশীলঃ গ্রামাঞ্চলে 0.26 এর কাছাকাছি ও শহরাঞ্চলে 0.30 এর কাছাকাছি ছি, যেটি তার পরে প্রতি বছরেই ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি

কর্মপ্রার্থী জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান অনুসারে আগামী 7 বছরে 100 মিলিয়ন (10 কোটি) কর্মসংস্থান দরকার হবে- *যা 5টি অস্ট্রেলিয়ার সমান।*

Centre for monitoring Indian Economy এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় *2018 সালে 1 কোটি কর্মসংস্থান নষ্ট হয়* এবং এই পরিস্থিতির সুরাহা হয়নি। চার পাশে যে ভাবে চা ও পান-বিড়ি ইত্যাদির ছোট দোকান এবং ই-রিকশা ইত্যাদি গাড়িতে ভরে যাচ্ছে, *তাতে স্পষ্ট আভাস মেলে যে অর্ধ-শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ-বিহীন জীবিকার এমন প্রসার।* নিচে 2016 থেকে 2018 সালের মধ্যে এক কর্মসংস্থানের চিত্র সেটা স্পষ্ট করে।

শিক্ষা	পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত	ষষ্ঠ-নবম	দশম-দ্বাদশ	স্নাতক ও উর্দ্ধে
কর্মসংস্থান (কোটি)	3.8	1.8	1.3	0.29

স্পষ্টতই অশিক্ষিতদের কর্মসংস্থান বেড়েছে তুলনায় বেশি। যত শিক্ষিত ততই তার সুযোগ কম। অর্থাৎ উৎকর্ষ-যুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম বাড়ার ফলে মানুষ নিজের যোগ্যতার চেয়ে নিচের স্তরের জীবিকা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। গবেষণায় বেসরকারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়াস 2013 সালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে লক্ষ্যণীয়। "Make in India" স্লোগানকে সফল করে প্রতিবেশী চিনের মতো আর্থ-প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব অর্জনের প্রয়াস কি সেভাবে দেখা যাচ্ছে? বহুল-আলোচিত বিষয় হলো শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের প্রসারের ফলে *কর্মসংস্থান সৃষ্টির* যে বিপুল সম্ভাবনা এদেশে রয়েছে- তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিশাল জনসম্পদকে উদ্ভাবনী কাজের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে যুক্ত করা। তার পূর্বশর্ত অবশ্যই তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা এবং কারিগরী ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করা। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এসব বিষয়গুলির অগ্রাধিকারের পরিবর্তে আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা, নাগরিকত্ব ও অনুপ্রবেশকারী সমস্যা। উচ্চ বর্ণ, নিম্ন বর্ণ, তপশিলি, ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু ইত্যাদি বহুধাবিভক্ত করে দেবার পরে আমাদের ভাবানো হচ্ছে যে অপর গোষ্ঠী ভাগ না বসালে কর্মসংস্থানের কোনো অভাব হত না। এভাবে তৈরী সোরগোলের আড়ালে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রনায়কদের সার্বিক ব্যর্থতা সুকৌশলে আড়ালের চেষ্টা চলছে। কিন্তু নতুন কর্ম সৃষ্টির বদলে যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ কর্মসংস্থান নষ্ট হয়েছে- তার তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

8. নগর সর্বস্ব কেন্দ্রাভিমুখী পরিকল্পনা।

বিশিষ্ট লেখিকা জয়া মিত্রের মতে ''ভারতবর্ষের মতো দেশে কৃষি ছিল শুধুমাত্র একটি উৎপাদন পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং বাস্তবসম্মত কলা ও বিজ্ঞানচর্চার ওপর নির্ভরশীল

সংস্কৃতি ছিল দেশের কৃষিসংস্কৃতি। সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ গ্রামসমাজের অন্য অনুসারী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার করা হত বলে দিন চলত অপেক্ষাকৃত কম উপকরণে।" বর্তমান নিবন্ধকারের মতে যে কোনো প্রকল্পই হোক না কেন, সর্বদাই তা মহানগরীগুলিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার অতিরিক্ত ঝোঁক অনেক সময়ে যুক্তিহীন। এছাড়া বৃহৎ শিল্পপতিরা ও আমলা/বাবুরা বেশির ভাগ সময়েই পছন্দ করেন ক্ষমতার কেন্দ্রে মহানগরের বিনোদন ও পরিকাঠামোর সুবিধায় বসবাস।

ভারত সরকারের 2018 নীতি আয়োগ প্রতিবেদন অনুসারে দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ সহ দেশের মোট 21টি শহরে ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষিত হয়ে যাবে 2020 সালের মধ্যে। এর ফলে 100 মিলিয়ন (10 কোটি) ভারতবাসী বিপন্ন হতে চলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রস্তাবিত আবাসন পরিকল্পনাতেও (NUPF 2018) লক্ষ্য *মহানগরগুলিতে ঘন-সন্নিবিষ্ট উচ্চ আবাসন- সেটি দাঁড়াবে অবাস্তব, অস্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ-ঘাতক।* যা হলো সুস্থিত ধারণার প্রতিকূল। সেজন্য সচেষ্ট থাকতে হবে যত বেশি সম্ভব কর্মপ্রার্থীকে নিয়োগের উপযোগী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মফস্বল শহর ও গঞ্জ বা গ্রামীণ এলাকায় গড়ে তোলা। প্রয়োজনে এর জন্য কারিগরী শিক্ষার অগ্রাধিকারে ও শিক্ষাক্রমে রদবদল আনা চাই। এজন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি নিয়ে যথাযথ সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা দরকার। *প্রতি জেলায় অন্তত একটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Incubation Centre-এর মাধ্যমে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও শিল্পস্থাপনে প্রাথমিক পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।* স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে পণ্য আমদানির বদলে দেশীয় উৎপাদন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা, বিশেষত প্রযুক্তি শিক্ষার উপরে জোর দিয়েছেন। তাঁর উন্নয়ন পন্থায় দারিদ্র দূরীকরণের সঙ্গে চাই দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠির সংস্কৃতির মর্যাদা ও স্বীকৃতি।

স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই আন্দোলনের নবীনতর নেতারা, বিশেষত সুভাষচন্দ্র বসু মনে করতেন- উন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারী শিল্পপতিদের হাতে থাকলে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে দেশবাসীর জীবনে উন্নতি আসতে। তাই স্বাধীনতার প্রাক্কালে 1938 সালে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যে প্ল্যানিং কমিশনের প্রয়াস ঘটে- তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হয় উৎপাদন ও বন্টন ক্ষেত্রে জনস্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতিতে। পরবর্তী কালে এই নীতির নানা সীমাবদ্ধতা দেখা দিলেও সদ্যস্বাধীন দেশের পক্ষে বহির্মুখী রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতির বদলে অন্তর্মুখী Import Substitution (IS) নীতি গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত ছিল।

9. কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম।

কিন্তু দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও জনকল্যাণমুখী লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির যে রূপরেখা গৃহীত হলো, 1958 সাল থেকে 2013 সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে-তার ঘোষিত উদ্দেশ্য যখন যাই থাকুক, সেগুলি লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক সময়ে যে পিছিয়ে পড়তে দেখা গেছে তার সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করা শক্ত নয় ঃ

- রাজনৈতিক সদিচ্ছায় ঘাটতি
- ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক বরাদ্দে অপ্রতুলতা
- গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী ও কর্তৃপক্ষের একাংশের মধ্যে কর্মনাশা আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার অনুপ্রবেশ।
- বিজ্ঞানমনস্কতাকে জাতীয় চেতনায় পরিণত করতে না পারা (Dhirendra Sharma, "Growth & Failure of India's Science of India's Science Policy", EPW, 1976)।

- সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির ঘন ঘন অভিমুখ বদল এবং তজ্জনিত বিভ্রান্তি ও দিশাহীনতা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ ওতপ্রোত; কিন্তু তাদের মেলবন্ধন হলো না- দূরত্ব বাড়তে থাকলো।

10. পরিত্রাণ কোন পথে?

একদা চরকা ও খাদির প্রসারের জন্য গান্ধীজি ও আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের কুটিরশিল্প নিয়ে যে উদ্যোগ তারও সীমাবদ্ধতা আছে- আচার্য নিজেও একটি রচনায় লিখেছেন যে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে হলে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে। পাশাপাশি বহু জায়গায় এই মতও দিয়েছেন যে- খোশগল্প করে অন্যভাবে সময় নষ্ট না করে পল্লীর দরিদ্র পরিবারে চরকা কাটার মাধ্যমে পরিবারের কাপড়ের প্রয়োজনমত সুতো মিলবে, ঘরের টাকা বের করে ধুতি-শাড়ি কিনতে হবেনা। এঙ্গেলসের বক্তব্য- পুঁজিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পের মালিকরা ক্রমশ তার গ্রাসে উড়ে যায়। তাঁদের নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণগুলো চলে যায় পুঁজিপতিদের কবলে। পুঁজিপতিরা একই সঙ্গে অনেক শ্রমিককে শোষণ করেন। এইভাবে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, আর শ্রমিকরাও জড় হতে থাকে এক জায়গায়। একটা পর্যায়ে এসে এই দুটি ঘটনা আর কিছুতেই পুঁজিবাদের বাহ্য আবরণের সঙ্গে খাপ খায় না। সেই আবরণ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। (এন্টি দ্যুরিঙ)

প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির সাপেক্ষে উৎপাদনশীলতা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। *প্রতি একক শ্রমশক্তির বা শ্রম-দিবসের সাপেক্ষে উৎপাদনশীলতা কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ছে না তো বটেই, বরং নানা প্রতিবন্ধকে আটকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।* কিছু বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো শ্রম- আইনকে যুগোপোযোগী করা দরকার। সর্বোপরি স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অগ্রগতি না হওয়ায় উৎপাদনশীলতার অবনতি ঘটেছে। এ দুই ক্ষেত্রেই সরকারের ও বণিক-সভাগুলির সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার রূপায়ন হলো সময়ের দাবি।

একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব

এখন প্রশ্ন হলো দারিদ্রের যে অচ্ছেদ্য চক্রের আবর্তনে জীবন চলছে - তা থেকে উত্তরণের প্রথম ধাপ কি? নানা মুনির নানা মত আছে- তবে মাঝারি, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের (MSME) সহায়তার জন্য সেগুলির কিছু পরিকাঠামোগত সহযোগিতা বা পোষকতা প্রয়োজন, সেগুলি সরকার অথবা সরকারের নির্দেশে বণিকসভা বা বৃহৎ শিল্পগুলি দিতে বাধ্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্ষুদ্রশিল্পগুলির নিজস্ব উৎপাদন বিভাগের পাশাপাশি এমন কিছু আরো আধুনিক যুগে প্রয়োজন হয়- যার ব্যয়বহন করার উপায় এই শিল্পগুলির থাকেনা, অথচ প্রয়োজন থাকে- বিপণন ও জনসংযোগ এবং নকশা বা ডিসাইন (Design) বিভাগের, সর্বোপরি প্রকল্পের Feasibility Study বা বাস্তবতা-সমীক্ষায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। একটি কেন্দ্রীয় Design and Marketing Hub সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বানিয়ে সেখানে এই ক্ষেত্রগুলির দক্ষ কর্মী ও বিশেষজ্ঞ রেখে, তাদের দক্ষতা যদি সংশ্লিষ্ট সব কটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্বল্পমূল্যে পেতে পারে- তাহলে ক্রমশঃ এ শিল্পগুলি যুগোপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাও নেওয়া যেতে পারে।

ব্রিটিশ তাত্ত্বিক ও লেখকরা কেন্দ্র তথা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ ও পরিধি তথা উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোচনা করেছেন- সম্ভবত তা অনেকাংশে শেষোক্ত দেশগুলির কেন্দ্র তথা মহানগরগুলি এবং পরিধি তথা মফস্বল ও পল্লী অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ঃ-

1. অর্থনৈতিক অগ্রসরতার সুবিধাগুলির বন্টনের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ দেশগুলিতে/মহানগরে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে (যেমন প্রযুক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক পণ্যের বিপণন এবং পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রে)।

2. পরিধিগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফলকে কেন্দ্রের/ মহানগরের প্রয়োজনে লাগানো।

3. চক্রবৃদ্ধি বৈষম্য পরিস্থিতি- উন্নয়নের যাত্রায় একবার বেশি বৈষম্য ঘটে গেলে, সেই পার্থক্য আর পশ্চাদপদ দেশের মফস্বলের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হবার বদলে বাড়তেই থাকে।

4. উন্নত দেশগুলি নিজস্ব প্রযুক্তি ও পুঁজি উন্নয়শীল দেশগুলিতে নিবেশ করে তাদের উন্নতির জন্য নয়; বরং নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।

উল্লেখ্য যে আঞ্চলিক উন্নয়নের (regional development) তাত্ত্বিক আলোচনায় শিল্প-উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলি ও তার অভিঘাত হলো গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক, বিশেষত উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পগুলিতে সাধারণত কারিগরী- প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ধরনের উচ্চ-কারিগরী শিক্ষা-প্রাপ্ত কর্মীদের মেলে উন্নত শহর বা মহানগরে- তার নগরায়নের ওপর নির্ভর করে; মফস্বলে মেলে খুব কম সংখ্যায়। পাশ্চাত্য নগর-বিশেষজ্ঞদের মতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে নগরগুলি বড়, মাঝারি ও ছোট এরকম বিভিন্ন গুরুত্বের- সেগুলি আবার পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে গ্রথিত থাকে।

উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) অবস্থান কোথায় হবে- সে বিষয়ে কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কার্যকরী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে এভাবেই মহানগরী ও তার শৃঙ্খলাধীন উপনগরীগুলির বৃদ্ধি ঘটে চলে। এভাবে যে বিশৃঙ্খল নগরায়নের প্রসারের নামে নৈরাজ্য ঘটে (agglomeration) তার ফলে এযাবত পুঁজিপতিরা মহানগরের আর্থিক পরিবেশ এবং একত্রে সরবরাহকারী দক্ষ শ্রমিক ও ক্রেতাদের বিপুল সমাগমের সুবিধা পাওয়ায় বাড়তি মুনাফা লাভ করতে থাকে; অথচ এর জন্য পরিবেশের যে ক্ষতি হয়, তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। উল্লেখ্য যে, একটি শিল্পনগরী গঠনের পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, এর সঙ্গে পরিবেশ এবং সামাজিক সংস্কৃতিক ও আচরণগত বিষয়ও জড়িয়ে থাকে।

একটি বাস্তব উদাহরণ

আমাদের দেশে তথা সব দেশেই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপায় হলো উন্নত প্রযুক্তি এবং সেজন্য *পুঁজি-নিবিড় (capital intensive) আধুনিকীকরণ।* একটি বাস্তব উদাহরণ এদেশের ইস্পাত শিল্পের থেকে নেয়া যাক। জামশেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানায় মূলধনী ব্যয় করে আধুনিকীকরণের ফলে উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যয় শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী উৎপাদন ব্যয় কমানোর পরিচিত পদ্ধতি শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করে। 1928-29 থেকে 1932-33 সালের মধ্যে চার হাজারের বেশি শ্রমিককে ছাটাই করা হয়, আবাসন বাবদ ব্যয় ও কর্মচারীদের পিছনে অন্যান্য ব্যয়ও কমানো হয়। (সূত্র- ড: সুনীল সেন, টাটা বাড়ির কথা)।

11. শুধু অরণ্যই নয়, প্রতিটি বৃক্ষকেও দেখা চাই

এটির আরো অগ্রসর রূপ আমরা সাম্প্রতিক তথাকথিত "শিল্পোত্তর সমাজে" দেখব- যেখানে শিল্পে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, এভাবে উদ্‌বৃত্ত কর্মীরা উন্নত দেশে হয় বাড়িতে বসে ভাতা পাচ্ছেন অথা নিম্নতর কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন, যেখানে কোনো দক্ষতা বা সৃজনশীলতার অবকাশ নেই। *এমন কর্মী-সংকোচনের ফলে কর্মহীনতা, মহানগর-মুখী জনস্রোত, স্বাস্থ্যহীনতা, অপব্যয়-প্রবণতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি বাড়ছে।* এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এমন কর্মহীনতার সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান দুষ্কর- বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাতব্বরি থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে অনেকটা মুক্ত করতে না পারা পর্যন্ত এটি মিটবে না। পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে আরেক

সঙ্কট হলো- পরিচালন-ব্যবস্থাকে পেশাদারী ও আধুনিক করতে না পারা। সমীক্ষা অনুসারে "for the period from 2000-01 to 2014-15, the share in the total number of firms of those organised as "private limited companies" rose form 22. 3 percent at the turn of the century to 28.1 percent in 2014-15, whereas the share of public limited companies and partnerships declined from 11.9 to 3.7 percent and 36 to 25.1 percent respectively."

বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে সম্প্রতি স্বনির্ভর উৎপাদনের পথ পরিত্যাগ করে অনেক বিশেষজ্ঞই পরামর্শ দিচ্ছেন সস্তা পণ্য আমদানির। ফলে যত দিন যাচ্ছে প্রযুক্তি-ক্ষেত্রে পরাধীনতা আরো বাড়ছে। এখন যেমন চিনের সস্তা বাল্বই শুধু নয়, গমের মতো বহু কৃষিজ পণ্যও ঢালাও আমদানি হচ্ছে। এটিই নাকি জাতীয় আয়ের পক্ষে লাভজনক। প্রশ্ন হলো এত বছরেও জাতীয় স্বার্থে সরকারের আমদানি বিষয়ে কোনো সুপরিকল্পিত স্পষ্ট নীতি নেই, কেন? এর সঙ্গে সম্প্রতি উপরি প্রতিবন্ধক দেখা দিয়েছে পুঁজি-সংকট, বিশেষত ছোট ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে। [Annual Economic Survey 2017-18 of CSO, Govt. of India]। ভারতের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকট বিষয়ে কিছু বিশেষজ্ঞের মত হল- বিনিয়োগ থেকে ফেরৎ আসার যে অভূতপূর্ব শ্লথতা তার প্রায় সবটুকুই বহন করতে হবে গৃহ-নির্মাণ (Household) শিল্পকে, যেটা নিজেই অভূতপূর্ব। মনে রাখা দরকার যে গৃহনির্মাণ শিল্প-সংশ্লিষ্ট থাকে অনেক অনথিভুক্ত ও প্রথাবহির্ভূত উদ্যোগ। এই পর্বে কিন্তু প্রাইভেট কর্পোরেট সেক্টারের লাভ ও সঞ্চয় আগের মতই তেজী থেকেছে।

সর্বোপরি, অরণ্য দেখতে গিয়ে প্রতিটি বৃক্ষকে ভুললে হবে না। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটলে, সেই লাভের সুফলে সমাজের কতজন এবং কোন অংশ উপকৃত হবে- সেটা বিচার্য বিষয়। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্যই বৃদ্ধি- এটাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা যায় না। চূড়ান্ত সাফল্য নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র GDP নয়, সাধারণ দেশবাসীর জীবনযাত্রার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে, যার জন্য দরকার সবার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। শুধু ক্ষুধা-নিবৃত্তির ব্যবস্থা নয়, জীবিকার সমাধান ছাড়া আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ অসম্ভব। কর্মহীনতা-জনিত মাদকাসক্তি, মানসিক ও শারীরিক রোগ, এমন কি আত্মহনন- এসবের জন্য জাতির যে ক্ষতি ও চিকিৎসা-ব্যয় তাকে হিসাবের বাইরে রাখলে চলবে কেন?

12. প্রযুক্তি-বিতর্কের কেন্দ্রে- আঁধার সমুদ্রে আলোর দ্বীপ

Mass-production অথবা Production by the masses এই বিতর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন E.F. Schumacher তার "Small is beautiful" বইটির (1973 খ্রীষ্টাব্দ) মাধ্যমে। লেখক প্রথমোক্ত শিল্পোৎপাদন সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন- *এটি সহিংস (violent), পরিবেশ-বৈরী, অনবীকরণযোগ্য সম্পদ ও শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আত্মঘাতী এবং সর্বোপরি কর্মীর স্ফূর্তি ও সত্তা ধ্বংসকারী।*

এতে লেখক দেখিয়েছেন- যদি কোনো কর্মী একটি শিল্প-সংস্থা স্থাপন করে বছরে গড়ে 5000 ডলার (অথবা টাকা) আয় করতে পারে, তাহলে সেই শিল্প-উদ্যোগটির জন্য পুঁজি-নিবেশ সীমিত থাকা উচিত ওই একই অর্থাৎ 5000 ডলার (বা টাকাতে)। এর থেকে বেশি নিবেশ প্রয়োজন হলে, সমাজে কিছু সীমিত মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে থাকবে। এ বিষয়ে লেখকের পর্যবেক্ষণ যে অনেকাংশে নির্ভুল তা দেশের বর্তমান অর্থনীতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। "প্রযুক্তি" নির্বাচনের সঙ্গে অনেক বিষয় নির্ধারিত হয়। উল্লেখিত লেখক যে 'উপযোগী প্রযুক্তির' ধারণা দিয়েছেন- তা সনাতন আধুনিক ক্ষেত্রের মতো

উৎপাদনশীলতায় অত পিছিয়ে নেই, আবার উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির মতো কর্মসংস্থান পিছু পুঁজি-নিবেশ এত বেশি নয়। লেখক জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে প্রতিটি শিল্পদ্যোগে কম বা মাঝারি পরিমাণ পুঁজি নিবেশ করে বহু সংখ্যক কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

তথাকথিত প্রাগ্রসর আধুনিক-প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নকে বলা চলে অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে জেগে থাকা কয়েকটি আলোকিত দ্বীপের মতো- অতি মুষ্টিমেয় জনসমষ্টির বিপুল বৈভব ঘটছে, বিপুল জনসমষ্টির দারিদ্রায়ণের (impoverishment) বিনিময়ে। এর দ্বিমুখী নেতবিাচক অভিঘাত হলো- বিপুল সংখ্যক কর্মহীন- বাহিনী সৃষ্টি এবং সেই ছিন্নমূলদের নগর, মহানগরী অভিমুখে জনস্রোত ও তজ্জনিত অপরিকল্পিত, অস্বাস্থ্যকর নগরায়ন তথা পরিবেশ-ধ্বংস। সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে বলা যেতে পারে-

1. বর্তমানে এই দ্বৈত অর্থনীতি (dual economy) চলতে থাকবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। অর্থনীতির ''আধুনিক অংশ'' সমগ্র কর্মপ্রার্থীদের গ্রহণে সক্ষম হবে না।

2. ''অনাধুনিক অংশের'' দিকে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন না নিলে, এটি ভেঙ্গে পড়ার আশংকা এবং তার ফলে কর্মহীনের সংখ্যা, সঙ্গে সামাজিক সমস্যা আরো বাড়বে- নগরমুখী জনস্রোত, অপরাধপ্রবণতা, অপুষ্টি ইত্যাদি। এতে অর্থনীতির অপর আধুনিক অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

3. দরিদ্রদের আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য সহযোগিতা করা সম্ভব এমন একটি প্রযুক্তি তার হাতে তুলে দেবার মাধ্যমে- যেটি তার সামর্থ্য ও দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ- গড়তে হবে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে মফস্বলে, যেখানে সিংহভাগ মানুষের বসবাস।

4. এই সব দেশগুলির পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিচক্ষণ ভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ''উপযোগী প্রযুক্তি'' গড়ে তোলা যেতে পারে-

ক) উচ্চ প্রযুক্তিকে কম-পুঁজির সাপেক্ষে যথার্থ সরলীকরণ ঘটিয়ে,

খ) ''অনাধুনিক''/চিরাচরিত প্রযুক্তিকে কম/মাঝারি পুঁজির সাপেক্ষে উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে,

গ) সরাসরি উপযোগী প্রযুক্তির উদ্ভাবন / আবিষ্কার করে।

13. উপযোগী প্রযুক্তির প্রসঙ্গ ও শ্রীনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের যে পল্লী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা- তা অনেকাংশে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর। 1922 সালে শ্রীনিকেতনে তার এই পুনর্গঠনমুখী শিক্ষাক্রম অধিকর্তা লিওনার্দ এলমহার্স্ট-এর নেতৃত্বে শুরু হয়। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল-

1. গ্রামবাসীদের নিজেদের সমস্যা নিজেদের সমাধানে উৎসাহিত করা-বাইরে থেকে কোনো কিছু না চাপিয়ে দিয়ে,

2. গ্রামবাসীদের নিজস্ব সমবায় উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি ও কুটিরশিল্পের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসার ও পল্লী পুনর্গঠন,

3. ভারতের পল্লীবাসীদের/ গ্রামবাসীদের এক উন্নত জীবনের সন্ধান দেওয়া- তাদের স্বাবলম্বনের শিক্ষায় ও গ্রামীণ কৃৎকৌশল ও শিল্পগুলির উৎকর্ষের প্রকরণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

4. এগুলির পাশাপাশি এক স্বনির্ভর শিল্প-গ্রাম গড়ে তোলা।

অন্যদিকে ''উপযোগী প্রযুক্তির'' প্রবক্তারা সর্বদাই পল্লী-উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে **মহানগর/আধুনিক অংশকে**

এড়িয়ে সরাসরি যথাস্থানে পৌঁছবার পক্ষে অর্থাৎ চুঁইয়ে পড়া (trickel down effect) উন্নয়নের বিপক্ষে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই নানা সময়ে আত্মশক্তি জাগরণ ও আত্ম-নির্ভরতার কথা বলেছেন। স্বদেশী সমাজ বলতে তার অভীষ্ট ছিল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নয় এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ- যে রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে আমদানি করা দর্শনে দিশায়িত নয়।

কবিগুরুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ''তার সমাজভাবনার অনুশীলন যে ক্ষয়ে গেল এর কারণ হিসেবে আমরা দেখি এই অনুশীলনটির পরিপূরক সংগ্রামের অনুপস্থিতি। তৎকালীন সমাজেও এবং তার চিন্তাতেও।''- এমনটাই অভিমত প্রাবন্ধিক শুভ্রনীল দত্তের। তাঁর মতে- শ্রমিক আন্দোলনগুলি বেশিটাই ব্যস্ত থাকে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে, যে অর্থনৈতিক মডেলটা সব সমস্যার মূলে, সেদিকে কারো লক্ষ্য থাকে না। এ কারণেই দেড় লক্ষ মানুষ উচ্ছেদের পরেও ঝাঁ চকচকে বিশ্বকাপে ভিড় করে তাকেই উন্নয়ন ভাবে মানুষ। এই সূত্রে পাঠকের মনে পড়তে পারে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার প্রাণপুরুষ শংকর গুহ নিয়োগীর স্লোগান- ''সংঘর্ষ ও নির্মাণ''। পাশাপাশি এই দুই পরিপূরক শক্তির যৌথ প্রসারে হয়ত একান্ত প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব। কবির ভাষায় - ''এ পথেই আলো জ্বেলে, এ পথেই পৃথিবীর ক্রম মুক্তি হবে'', হয়ত ভবিষ্যতে। পল্লী ও ছোট মফস্বল শহর-গঞ্জ নির্ভর প্রান্তকে কার্যতঃ বেশিটাই উপেক্ষা করে এমন খন্ডিত শিল্প ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতির এদেশে সাফল্য যেমন অবাস্তব; তেমনই ঘন ঘন অভিমুখ বদলের ফলে লক্ষ্যপূরণের বহু সম্ভাবনা সত্ত্বেও কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো অবস্থা এই নীতির। বলার অপেক্ষা রাখেনা, এদেশে প্রতি পদে আমলাতন্ত্র ও তাদের এক আত্মম্ভরী উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জনমুখী নীতি রূপায়ণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই ফাঁক থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ও তার সঙ্গে শিল্পায়নের ক্ষেত্রটি কীভাবে কতদিনে মুক্তি পাবে, কতদিনে একটি উৎযোগী, যথাযথ এবং রূপায়ণযোগ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি এদেশে স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ দেখাতে পারবে, তার উত্তরের হদিস এখনও মিলছে না।

তথ্যসূত্র ঃ

1. P.J. Thomas- "India's basic Industries", Orient Longman (1948)
2. Anupriya Singhal & Aoneha Tagore- Big Industry before Independence 1860-1950, Internship Paper, Centre for Civil Society (2010)
3. Statistical Atias, West bengal, 1953- State Statistical Bureau.
4. "Small in beautiful", E.F. Schumacher, 1973.
5. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ''ভারতের শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির পদচিহ্ন: কোন অভীষ্টের অভিমুখে'', উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস (দিল্লী), জুলাই-আগস্ট '2019.
6. প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রচনা সংকলন/প্রথম খন্ড, প্রকা-অধ্যক্ষ, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (2008)
7. রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
8. ''নবরবিকিরণে''- রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষ সংকলন, 2011 পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের কর্মীবৃন্দ
9. ডঃ সুনীল সেন, ''টাটা বাড়ির কথা'', এ মুখার্জি এণ্ড কোং (1392 BS)
10. জয়া মিত্র, ''আমার ভারতবর্ষ'', ''দেশ'' 17 মে, 2019, ভারতচেতনা সংখ্যা
11. T. Raychaudhuri, "A Re-Interpretation of Nineteenth Century Indian Economic History" (The Ind. Eco. & Soc. Hist Revw., Vol 5, No.1, 1968)
12. "Third world Tomorrow", Paul Harrison, Pilgrim Pr., June 1983
13. Dhirendra Sharma, "Growth & Failure of India's Science Policy", EPW, (1976)
14. NITI Aayog Report 2018
15. Frontier, 15-21 September 2019 issue and 29 September - 26 October 2019 issue.

আলোকের এই ঝর্ণা ধারার মৃত্যুবাণ

শংকর ঘটক
E-mail : sankarcsir@gmail.com

300 কোটি বছর ধরে পৃথিবীর আলো আঁধারের ছন্দে জন্ম হয়েছিল প্রাণের, বিভিন্ন প্রজাতির এবং চলমান ছিল জীবনের গতি। চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্রর সম্মিলিত চলনে পর্যায়ক্রমিক আলো-আঁধারের জীবনচক্র সহায়ক গতি আজ তার ছন্দ হারিয়েছে। খলনায়ক মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম আলো। রাতের আঁধারকে দূরে হাটিয়ে শহর হয়ে গেল আলো ঝলমল। বিশ্বের প্রাণ সৃষ্টির নেপথ্যে আলোর ভূমিকাকে বেবাক নস্যাৎ করে দিয়ে আলোক সজ্জাকেই সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করার প্রকৃতি বিরোধী প্রচেষ্টা মানুষের। ঈষৎ হালকা চালে বলা হয়ে থাকে— পাইকারি হারে রাত্রিকে অন্ধকার মুক্ত করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল সেই দিনটিতে যেদিন থমাস আলভা এডিসন তাঁর মেধা জাত প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্বটি বাজার জাত করলেন। বর্তমান বিশ্ব আলো ঝলমল। 2017 সালের হিসেবে, বিশ্ব জুড়ে শুধু রাস্তার আলোক স্তম্ভর সংখ্যা আনুমানিক 30 কোটি এবং সংখ্যাটি দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। আলোকিত বহুতল, বহুবর্ণের আলোক সজ্জায় বিলবোর্ড, ফ্লাডলাইট, যান বাহন, কোটি কোটি মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি। আলো রাতটাকে দিন করে ফেলছে। আমরা রাতের অন্ধকার পছন্দ করিনা। রাতের আকাশে আর তারা দেখা যায় না। রাতেও আকাশ উদ্ভাসিত। পৃথিবী থেকে যে আলো আমরা পাঠাচ্ছি সেটাই আবার প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে। তারারা থাকছে অদৃশ্য। রাতের আকাশ যেমন থাকার কথা তার থেকে কয়েক হাজার গুণ আলোকোজ্জ্বল সে এখন। তারারা কোথাও হারিয়ে গেল আপন মনে, আমরা খেয়ালও করলাম না। মেতে রইলাম আলো নিয়ে। ট্রাভিস লঙ কোর (Travis Long Core), সাদর্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-বিদ আর লসএঞ্জেলসের আর্বান ওয়াইল্ড ল্যান্ডস গ্রুপের বিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা জানালেন ''লা ভেগাস আর ক্যালিফোর্নিয়ার নৈশ আলোক প্রভা 300 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিয়েরা নাভাডা থেকেও দেখা যায়।''

আলোক দূষণ

''প্রান্তরের পারে তব তিমিরের খেয়া
নীরবে যেতেছে দুলে নিদালি আলেয়া।
-হেথা, গৃহবাতায়নে নিভে গেছে প্রদীপের শিখা,
ঘোমটায় আঁখি ঘেরি রাত্রিকুমারিকা-
চুপে চুপে চলিতেছে বনপথ ধরি।
আকাশের বুকে বুকে কাহাদের মেঘের গাগরী
ডুবে যায় ধীরে ধীরে আঁধার সাগরে।
ঢুলুঢুলু তারকার নয়নের পরে-
নিশি নেমে আসে গাঢ়...''

(জীবনানন্দ দাশের আলেয়া কবিতার অংশ)

দূষণ নিয়ে বিস্তর সোরগোল। জলের দূষণ, বায়ুর দূষণ, শব্দের দূষণ এমনকি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের

দূষণ, পারমানবিক বর্জ্যের দূষণ, কিন্তু কেউ উচ্চারণ করেনা আলোর দূষণ শব্দটি। বাকি সমস্ত দূষণ মাপার একটি করে মাপ কাঠিও আছে। যেমন ধরা যাক শব্দ দূষণ, 90 ডেসিবেল থেকেই যার শুরু বলে বলা হয়। অথবা জলে আর্সেনিক দূষণ মাত্রা। জলে আর্সেনিকের সহন মাত্রা সর্বোচ্চ 0.01 মিলিগ্রাম আর্সেনিক প্রতি লিটারে। মোবাইল ফোন কেনার সময় একটি ছোট কাগজে অতি ক্ষুদ্র হরফে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের দূষণ মাত্রাটিও দেওয়া থাকে। এইসব মাপ জোকের নেপথ্যে অনেক গল্প থাকলেও একটা ধারণা দেবার চেষ্টা অন্ততঃ থাকে। আলোক দূষণের জন্য এই ন্যূনতম চেতনাও দেখা যাচ্ছেনা। চেষ্টা সুদূরপরাহত। একদল বিজ্ঞানী সমানে সাবধান করে যাচ্ছেন বটে-আলো কমাও, বিশ্ব বাঁচাও। কেউ শুনছে না সে কথা।

বিশ্বে আলোর দূষণের প্রভাব ঃ

প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে শক্তি খরচের বিষয়টি। যত আলো তত শক্তি খরচ। আর যত বেশি শক্তি খরচ তত বেশি দূষণ। এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, আরও হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে তা জানা নেই। আমরা আজ ভাবব অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে যা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। বিষয়টি হল আলোক দূষণের কারণে বাস্তু-সাম্য আর বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক ছন্দের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সামগ্রিক বাস্তু-সাম্যে ভাঙন। শুধু বন্যপ্রাণীই বা কেন, কোটির ওপর প্রাণী, এক কোষি থেকে উন্নত স্তন্যপায়ী, জলচর-উভচর-স্থলচর সকলেরই জন্ম মৃত্যু, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নির্ভর করছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতির নির্ভুল ছন্দর ওপর। পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতা আর আলোর নিয়ন্ত্রিত ছন্দবদ্ধ চক্রের ওপর। শুক্ল পক্ষ-চন্দ্র পক্ষ, ছটি ঋতু চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। পলে পলে পাল্টে যায় বিশ্বের চেহারা। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের প্রধানতম শর্তই এটা। এই সেই ছন্দময় গতিময়তা। অমাবস্যার রাত আর পূর্ণিমার রাত এক নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে ফেললে প্রাণী জগত অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়বেই। প্রাণের উন্মেষ অথবা প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখা, উভয়ের জন্যই এই কথাটি সত্য। ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে এখন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমান পৃথিবী চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। কয়েকশ কোটি বছর ধরেই বিশ্বপ্রাণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতির নির্ভুল ছন্দের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেন্ডের এই চলন ছন্দ পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ আর প্রাণীর ডি এন এ (DNA) তে সংকেত-অক্ষরে লেখা (encoded) আছে। মানুষ আহাম্মকের মত রাতে আলো জ্বালিয়ে সেই সুনির্দিষ্ট ছন্দচক্র চৌপাট করে দিল। প্রকৃতির ছন্দচক্রের উপর নির্ভর করেই উদ্ভিদ আর প্রাণী জীবনচক্র বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়-প্রজনন, পুষ্টি, ঘুম আর আত্মরক্ষা করে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলাফল আতঙ্কজনক। রাতের আলো ইতিমধ্যেই কীট পতঙ্গ আর উদ্ভিদ সহ সমস্ত প্রাণীদের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। অনেক কীট-পতঙ্গ ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত। এ এক বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। বর্তমান নিবন্ধে শুধু পাখীদের কথা নিয়েই ভাবার চেষ্টা করব।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উইসকনসিন

রাজ্যের বিখ্যাত নদী মিলআওকি (Milwaukee), পক্ষীকুলের স্বর্গ, নজরে এলা মুনাফা কারবারিদের। 1880 খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হল মিলআওকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোজিন বিল্ডিং, এক বিশাল ইমারত।

মিলআওকি নদী

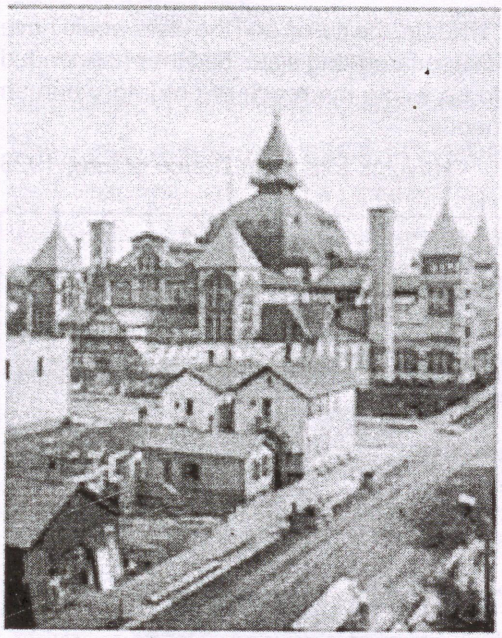

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোজিসন বিল্ডিং, 1880

(বর্তমানে নদীটির অববাহিকা আবাসন শিল্প দখল করেছে।)

1887 সালের 23শে সেপ্টেম্বর সেই অঞ্চলটি পরিদর্শনে এলেন স্বনামধন্য পক্ষী বিশেষজ্ঞ লুডউইগ কুমলিয়ে (Ludwig Kumlien)। মিলআওকি নদীর তীরে নয়নমনোহর- অট্টালিকার 60 মিটার উঁচু মিনারের ওপর উঠে এলেন লুডউইগ। পরিযায়ী পাখীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য আদর্শ স্থান। লুডউইগের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ নয়, পরিযায়ী পাখীর সঙ্গে গোপন অভিসার নয়, তাঁর অতি প্রিয় পক্ষীকুলের আচরণ অনুধাবন করাও নয়, এবারের আগমনের গূঢ় কারণ পক্ষীকুলের মৃত্যুফাঁদ নিজের চোখে দেখা।

সন্ধ্যে হতে না হতেই চারখানা বিশাল বিশাল শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ফ্লাডলাইটের আলোর বন্যা চারদিক প্লাবিত করে দিচ্ছে। শীতকালীন বাসস্থানের খোঁজে দক্ষীণমুখি পাখীর দল সেই কৃত্রিম আলোর দিকে উড়ে আসছে। কেউ তারের বেড়া জালে জড়িয়ে, কেউ বা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কিতে প্রাণ বিসর্জনও দিচ্ছে। এই রকমটাই ছিল লুডউইগ কুমলিয়ের অভিজ্ঞতা। এটাই ছিল পরিবেশ জগতের ওপর কৃত্রিম আলোর কুপ্রভাবের প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণ।

কর্নেল ল্যাব অফ অরনিথোলজি (পক্ষী-বিদ্যা)র একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। 2019 এর 10ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে সেই সমীক্ষা। শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকার মূলতঃ তিনটি শহর, শিকাগো, হাউসটন আর ডালাসের বৈভব পূর্ণ আকাশ ছোঁয়া প্রসাদের আলোর-সমুদ্রে বছরে 60 কোটি পাখীর মৃত্যু হয়। এই প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বের আলোর বন্যায় পক্ষীকুলের সর্বনাশের

ব্যাপকতা অনুমান করা শক্ত নয়।

There goes the night প্রবন্ধে স্টেফনি পেইন লিখছেন "বিশ্ব ক্রমাগত তার গভীর অন্ধকার রাত হারিয়ে চলেছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই পৃথিবীর কৃত্রিম ভাবে আলোকিত অঞ্চলের পরিসীমা বছরে 6% হারে বেড়ে চলেছে। 2017 সালের উপগ্রহ পাঠান তথ্য অনুসারে ঐ বৃদ্ধি বর্তমানে 2.2% হারে বেড়ে চলেছে। বিশ্বের 83 শতাংশ (ইয়োরোপ এবং আমেরিকার 99% এর বেশি) মানুষ দূষিত আকাশের নিচে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক তৃতীয়াংশ মানুষ আর ছায়াপথ দেখতেই পান না।"

দলে দলে পক্ষীকুলের মৃত্যু বিগত শতকের আঁধার ঘোষণা করল। পরিবেশবিদরা অবাক হয়ে দেখলেন শয়ে শয়ে সামুদ্রিক কচ্ছপ সমুদ্রকে পেছনে রেখে সাগর তটের আলোকিত পানশালা লক্ষ করে এগিয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ওরা। এবার উদ্বিগ্ন হবার পালা পরিবেশবিদদের। গোধূলি অতিক্রান্ত, দিবা অবসান, তবুও দিনের প্রাণীদের বাসায় ফেরার উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছেনা। নিশাচর যারা, তাদের বাইরে বেরুবার তাগিদ নেই। আবার অন্য প্রান্তে, সূর্য দেখা দেবার বহু আগেই শুরু হয়ে যায় প্রত্যুষের কোলাহল। গাছও বাদ নয়। ওদের ফুল ফুটছে সময়ের আগে আর পাতা ঝরছে পরে। জীববিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসলেন, পরীক্ষাগারে এই সব বিশৃঙ্খলার তদন্ত প্রয়োজন। শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ওপর আলোর প্রভাব। নিদ্রা, পরিপাক থেকে অঙ্কুরোদ্গম, পুষ্পোদ্গম, সবকিছু নিয়েই অনুসন্ধান। গবেষণা অনেক তথ্য সামনে এনেছে, এমন কথাও বলেছে যে শেষের সে দিন আর দূরে নয়। আমরা নির্বিকার।

"The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago... had they happended to be within the reach of predatory human hands."

- Havelok Ellis, The Dance of Life, 1923

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	বি 27/1 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা - 89
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি 27/1 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-89
মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইন্টারনিটি প্রেসের পক্ষে এস.এন.আর্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্য।

স্বা : রবীন মজুমদার

প্রকাশক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কৃষির রূপান্তর - একটি অভিজ্ঞতা

রবীন ব্যানার্জী
E-mail : rabibanerjee@gmail.com

বেশ কয়েক বছর আগে শবর সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ নিয়ে হাজির হয়েছিলাম পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের রাজনাওয়াগড় গ্রামে।

আশে পাশের গ্রামে ঘুরতে গিয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম, অনেকেরই জমি-জমা আছে, কিন্তু জলের অভাবে চাষাবাদ নেই। তাই বাধ্য হয়েই এখানকার মানুষেরা জেলার বাইরে, রাজ্যের বাইরে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেন।

শুকনো ফুল ফসল সংগ্রহ করে বিক্রী- একটি পরিপূরক আয়ের পন্থা

মনের তাগিদেই, ওদের আয়ের পথ খুঁজতে আমি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াই। একটা নতুন পথের দিশাও পাই, শুকনো ফুল গাছের কান্ড ছাড়াও ডাল-পালা, ফল, পাতা ইত্যাদি। বাণিজ্যিক ভাবে কান্ডটা মূল্যবান। কান্ডটা বিক্রি করতে গেলে গাছটাই কেটে ফেলতে হচ্ছে। কিন্তু গাছটা বাঁচিয়ে রেখে ফল, ফুল, পাতা এমনকি ডালপালাও পণ্য করতে শিখিয়েছে শুকনো ফুল শিল্প। ওরা এগুলোকে ব্লিচিং এবং ডাইং করে ঘর-সাজানোর কাজে ব্যবহার করে। দেশে বিদেশে বিশাল চাহিদা। 2015-16 অর্থবর্ষেই বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল 1400 কোটি টাকার পণ্য। দেশের চাহিদাও কম নয়, তবে তার কোন সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। কাজটা সম্পূর্ণ গ্রাম-নির্ভর। একাজে অটোমেশন কোন দিন প্রবেশ করতে পারবে না। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে।

কথাবার্তা চালু করলাম তামিলনাড়ুর টুটিকোরিনে অবস্থিত ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি কারক সংস্থা Fauna International-এর সঙ্গে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট থেকে মেঘালয়, ত্রিপুরা। প্রতিটি রাজ্যের ছোট বড় জঙ্গল, বন-বাদার, গ্রাম, জনপদ থেকে কাঁচা মাল পৌঁছে যায় তামিলনাড়ুর টুটিকোরিনে। সেখানে ছোট বড় অনেক কারখানা। তাই সর্বদাই সেখানে একটা বড় ধরনের বাজার তৈরি হয়ে আছে।

পুরুলিয়ার বনে বাদারে, জঙ্গলে অফুরন্ত জন্মায় ধুঁধুল (Lufa), পলাশ গাছের পাতা, পাকা তালের বোঁটা, পুরুষ তালের স্টিক, গাছতলায় পড়ে থাকা সোনাঝুড়ি গাছের ফল, অর্জুন গাছের ফল ইত্যাদি হাজার হাজার "অপ্রয়োজনীয়" জিনিসই Dry Flowers Industry'-র পণ্য। গ্রামের মানুষ এগুলোকে হয়তো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন বা করতে পারেন। কিন্তু জ্বালানি তো তখনই প্রয়োজন, যখন ঘরে চাল থাকবে। জ্বালানির একটা অংশ বিক্রি করে চাল কিনতে পারার সুযোগ করে দেওয়াটাই আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছিল। পুরুলিয়ার কিছু পরিবারের কাছে এটাও একটা ক্ষুদ্র আয়ের পথ তৈরি করতে পারে। বাড়িতে থেকেই নিজেদের রুটি রুজি রোজগার করার পথ। ভাবনাটাকে নিয়ে হাজির হয়েছিলাম জেলা DRDC অফিসে। তাঁরাও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জনা চল্লিশেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) মহিলাকে (দলনেত্রী) ঠিক করে দেন পুঞ্চা ব্লকের WDO শ্রমতি অনিতা সাহু মন্ডল। সেই

মহিলাদের নিয়ে ট্রেনিং শুরু হ'ল কেন্দা কমিউনিটি হলে। টানা সাত দিন চললো।

নমুনা গুলো সংগ্রহ করেছিলাম Fauna International থেকেই। ল্যাপটপে গাছের ছবি তুলে ধরতেই অনেকেই চিনে ফেললেন। বাকিরা অপরের থেকে চিনে নিলেন আঞ্চলিক নামে। পণ্য চেনাটাই তো কাজের কথা নয়। কি করতে হবে, সেটা হাতে কলমে শিখে নেওয়াটাই আসল কাজ। কোথায় কি পাওয়া যাবে সেটাও ওনারাই খুঁজে বার করলেন।

তাঁদের সঙ্গে জঙ্গলে, বনে বাদারে গিয়ে, স্বচক্ষে দেখে নিলাম। কিছু কিছু সংগ্রহ করলাম। যে যে পণ্য পাওয়া যাবে তার পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারলাম। কি ভাবে বিক্রি হবে সেটা নিয়ে আলাপ অলোচনা শুরু করে দিলাম। কাঁচা নয়, শুকনো পণ্য সংগ্রহ করা, ময়লা থাকলে পরিস্কার করা, ভালো করে শুকনো করা। যেহেতু ক্রেতা Fauna International, বিক্রেতা SHG'র মহিলারা। তাঁরাই মুখোমুখি বসে ঠিক করবেন পণ্য কেমন হতে হবে, কি ভাবে ময়লা পরিষ্কার করে শুকনো করতে হবে। কত দাম পাওয়া যাবে। আমাদের কাজ অনুঘটকের। সেই পথেই এগিয়ে গেলাম। পঞ্চায়েত প্রধান পার্থসারথি মাহাতোর সহযোগিতায়, কেন্দা কমিউনিটি হলে, শুরু হ'ল ক্রেতা বিক্রেতার মিলন মেলা।

পণ্যের দাম, চাহিদা, জোগান সব বিষয়েই বিক্রেতার সঙ্গে আলোচনা করতে হাজির হলেন Fauna International এর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত এম আর সিংভি, DRDC' র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত অমল আচার্য্য, সমগ্র বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান পার্থসারথি মাহাতো। SHG এর মহিলারা জানালেন, তাঁরা কি কি সংগ্রহ করতে পারবেন। সিংভিজি জানালেন তাঁদের সংগৃহীত পণ্য, টিটাগর গোডাউনে পৌঁছে দিলে, কি দাম পাওয়া যাবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উঠে এলো আরো একটা নতুন দিশা। পাঁচ জন SHG' র মহিলাকে টুটিকোরিনে কারখানায় সাত দিনের ট্রেনিংয়ে পাঠানো। তারা স্বচক্ষে দেখে আসুন bleaching dying'এর কাজ, তাঁরা দেখলেই বুঝতে পারবেন, তাঁদের কি করতে হবে।

পাঁচ জন মহিলা, যাঁরা কেবলমাত্র পুরুলিয়ার বাংলাভাষায় কথা বলতে পারেন, তাঁরাই পাড়ি দিলেন তামিলনাড়ুর টুটিকোরিনের পথে। সঙ্গে একমাত্র পুরুষ অনাথ বাবু, তাঁর দায়িত্ব ঠিক করে নিয়ে যাওয়া এবং ঠিক করে বাড়ি ফিরিয়ে আনা। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে টুটিকোরিন হয়ে পুরুলিয়া স্টেশনে ফিরে আসা পর্যন্ত (যাতায়াতের ভাড়া, ট্রেনে খাওয়ার খরচ, টুটিকোরিনে থাকা-খাওয়া) সব ধরনের খরচ বহন করেছিল Fauna International.

আরও অনেকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে DRDC' পরবর্তী পদক্ষেপ নিল নিতুরিয়া ব্লকের গড়পঞ্চকোট পাহাড়ে। হাতে এল আরো একটা নতুন দায়িত্ব। আরও অনেক SHG-র মহিলাদের হাতে কলমে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন BDO সংলাপ ব্যানার্জ্জী, ট্রেনিংয়ের জন্য খুলে দিলেন কৃষি মান্ডি। পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন DLT জয়দীপ চ্যাটার্জ্জীর হাতে। ট্রেনিং শুরু হলো, চললো কয়েকদিন ধরে। যদিও SHG'র মহিলাদের কাছে, এইসব গাছের ডাল পালা, ফল, ফুল, পাতা খুবই পরিচিত, এবার নতুন করে চিনলেন Dry Flowers Industry'র জন্য।

চাষাবাদের ভাবনা

Dry Flower Industry তে যত কর্মসংস্থান হোকনা কেন, পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করা যাবে না। সেটা সম্ভব একমাত্র চাষাবাদের মাধ্যমেই। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তারই খোঁজে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Teqip Hall'এ এক সেমিনার-এর আয়োজন করা হল। সহযোগিতা করেছিলেন জে.ইউ. সায়েন্স ক্লাব। উক্ত সেমিনার-এ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অসিত চক্রবর্তী, জৈব কৃষির জাতীয় কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুজয় বসু ও অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত, যাদবপুরের IICB-এর ডাঃ তুষার চক্রবর্তী, বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী অর্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়, অভ্র চক্রবর্তী, ফুলিয়া সরকারি খামারের ADA বিশিষ্ট দেশি ধান বিশেষজ্ঞ ডঃ অনুপম পাল, পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন বিজ্ঞানী ডঃ দেবপ্রিয় মুখার্জী প্রমুখ। সেখানেই উঠে এলো কৃষির বর্তমান বিপদের কথা।

1960-এর দশকেই ভারতের পরম্পরা ফসলের বীজকে বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ। গোবর, এতযুগ ধরে যা ছিল জৈব সার, তাকে সরিয়ে দিয়ে আনা হয়েছিল রাসায়নিক সার। চাষে গোবরের ব্যবহার কমে যেতেই গবাদিপশুর প্রয়োজনীয়তা কমলো। লাঙলের দখল করলো ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার। হাজির হ'ল কীটনাশক, মারা গেল সাপ, ব্যাঙ সহ জমিতে থাকা ফসলের বন্ধু জীবাণু। আজ আর মাঠে প্রজাপতির দেখা মেলেনা। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি অজান্তেই বিষের প্রভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তাই আজ বহু মাঠেই দেখা যায় ছোট ছোট বাচ্চারা কাঠি দিয়ে পরাগ মিলনের কাজ করছে।

ব্যাঙ, সাপ মরে যাওয়ার ফলে, ফসলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আরও নতুন নতুন পোকামাকড়। আরও কীটনাশকের নামে আরও কঠিন বিষ প্রয়োগ করা হ'ল জমিতে। যা খাদ্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের দেহে প্রবেশ করতে লাগলো। ভারতে অনুমোদিত কীটনাশকের সংখ্যা 200র বেশি, তার প্রায় আশি শতাংশই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানব দেহের জন্য চরম ক্ষতিকারক। আজ তার অধিকাংশই বিশ্বের বহু দেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ভারতে তা বহাল তবিয়তে প্রয়োগ হচ্ছে। ফলে ক্যানসার, ডায়াবেটিস, কিডনি বিকল ইত্যাদি রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বান্ধ্যাত্ব, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিন দিন বাড়তেই থাকছে। এর থেকে মুক্তি না পেলে আমরাও বাঁচবো না, ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকেও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

প্রাকৃতিক ও জৈব চাষের উদ্যোগ

সেমিনারে বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানীদের মতামত থেকে উঠে এলো এক নতুন পথ, প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতিতে দেশি ফসলের চাষাবাদের কথা।

কিন্তু এতদিন ধরে যে মানুষগুলো রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছা নাশক ব্যবহার করে চাষাবাদ করেছেন, যাঁরা কখনো জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ দেখেনি, তাঁরা কি করে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ মেনে নেবেন? শুরু হলো মানুষের কাছে নতুন প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার কাজ।

ঝালদা-দুনম্বর ব্লকের বেগুনকোদর, মুরগুমা ও

চাতমবাড়ি গ্রামের SHG র মহিলাদের নিয়ে শুরু হলো পথ চলা। প্রতিটি মনুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শোনালাম রসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছা নাশকের বিপদের কথা। কিন্তু জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কেউ মানতেই চাইলেন না। অনেক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের থেকে এক বিঘা করে জমি চাইলাম। সেই আবেদনে মাত্র 200 পরিবার সাড়া দিলেন। শুরু হলো জৈব পদ্ধতিতে কালাভাতের চাষ। বহু বছর ধরে অব্যবহৃত গোবর, গোচোনা, চিটে গুড়, ডালের গুঁড়ো বা ব্যাসন, উইটিপির মাটি, আর পরিমাণ মত জল। তাই দিয়ে তৈরি হ'ল জৈবসার। জৈব পদ্ধতিতে চাষের জন্য এটাই একমাত্র সার। ধান রোপণ থেকে ধান পাকার আগে পর্যন্ত এটাই ব্যবহার করে চাষাবাদ শুরু হ'ল। সাতজন কমিউনিটি রিসোর্স পারসন (CRP) প্রতিটি SHG'র মহিলাকে হাতে কলমে শেখালেন, কিভাবে তৈরি করতে হবে জৈব সার, বীজতলা, শ্রী পদ্ধতিতে ধান রোপণ, ধান ক্ষেতের পরিচর্যা।

এতদিন যাঁরা গোছা গোছা ধানের চারা ইঞ্চি ছয়েক দূরে দূরে রোপণ করতেন, শত শত টাকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করতেন, তাঁদের দিয়ে শ্রী পদ্ধতিতে এক ফুট অন্তর একটি করে ধানের চারা রোপণ। এক কেজি চিটে গুড়, এক কেজি পোকা খাওয়া ডাল বা ব্যাসন, কেজি পাঁচেক গোবর, কেজি পাঁচেক গোচোনা, কিছুটা উইটিপির মাটি, 100 লিটার জল থেকে দিন পনেরোর মধ্যে তৈরী বস্তুটাই সার ও কীটনাশক হয়ে যাবে? খেতে ছড়িয়ে দিলেই ধান হবে? এটা সার হ'ল? এটা স্প্রে করলে ধান হবে? সংশয় কাটেনা।

সার, বিষ বিক্রেতাদের প্ররোচনায়, গ্রামের সবার কাছে এটা এতোটাই হাস্যাস্পদ হয়েছিল যে প্রায় অনেকেই SHG'র মহিলাদের দেখলেই জানতে চাইতেন যতটা বীজ ছড়ানো হয়েছিল ততগুলো ধান ফলবে তো? আমাদের দৃঢ়তার সামনে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি বলেই কেবলমাত্র ওই জৈবসার স্প্রে করানো গিয়েছিল।

প্রতিটি ধানের চারা থেকে 30/40টা করে পাশকাঠি উঠলো। চারা রোপণের সময় যে কৃষকেরা অসম্ভব বলেছিলেন তাঁরাই অবাক হয়ে বারংবার মাঠে গিয়ে নিজেরাই অন্যান্য জমির সঙ্গে তুলনা করে মূল্যায়ণ করেছিলেন।

ঝালদা-দুনম্বরের BDO'র আহ্বানে এলেন ডঃ অনুপম পাল, অধ্যাপক পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, কানাডা প্রবাসী ভারতীয় শান্তনু মিত্র ওরফে টনি মিত্র। সবাই এলেন বেগুনকোদরে। শান্তনু মিত্র তুলে ধরলেন গ্লাইফোসেটের বিপদের কথা।

পৃথিবীর একমাত্র বিষ, যা গাছের খাদ্য তৈরি করার শৃঙ্খলাকে স্তব্ধ করে দিয়ে গাছের শিকড় পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারে। মানবদেহেও একই ভাবে কাজ করে। যিনি এই স্প্রে করছেন তাঁরও শরীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এই বিষ, ভেঙ্গে যায় তাঁর শরীরের DNA শৃঙ্খল। অথচ কীটনাশক বিক্রেতারা এটাকেই ঘাস মারার-বিষ নয়, ওষুধ বলে বিক্রি করে। শুধু বেগুনকোদরে নয়, মুরগুমা ও চাতামবাড়ি গ্রামের প্রায় প্রতিটি মাঠে ঘাটে ধানক্ষেতে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষের কাছে সহজ সরল ভাবে বুঝিয়েছিলেন টনি মিত্র। ছবির মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে কি করে। ক্যানসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি ভয়াবহ রোগের উৎস কোথায়। (টনি মিত্রের বক্তব্য আলাদা করে বক্সে দেওয়া হয়েছে)। অধ্যাপক

পরিতোষ ভট্টাচার্য্য শুনিয়েছিলেন, অন্যান্য রাজ্যের জৈব চাষাবাদের ইতিহাস। ডঃ অনুপম পাল শুনিয়েছিলেন দেশি ধানের ইতিহাস, চাষ করার পদ্ধতি। বুঝিয়েছিলেন কত সহজে দেশি ধানের চাষ করা সম্ভব।

গ্লাইফোসেটের ইতিকথা

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন অশান্ত করা মনশান্ত (Monsanto) নামক এক কুখ্যাত কৃষি রাসায়নিক নিগম গ্লাইফোসেট নামক এক অপ্রাকৃত অণুর উদ্ভাবককে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে, সেই অণুটিকে, যা এতদূর অবধি বয়লারের পাইপ পরিস্কারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল, তাকে কৃষিকার্যে এক আগাছানাশক হিসেবে প্রবর্তন করে। গ্রহগত পরিবেশের, খাদ্যের পুষ্টির, এবং জীবস্বাস্থ্যের বিধ্বংস পালার উৎপত্তি হয় সেই দিন থেকে।

গ্লাইফোসেট অণুটিকে নিয়ে নানা নামের আগাছানাশক বাজারে পাওয়া যায়। 'Roundup' তার একটি এবং সবচেয়ে পরিচিত মার্কা। এর পেটেন্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বহুদিন, তাই আজ নানা কোম্পানি তাকে নিয়ে নানা নামে বিক্রি করে।

কোম্পানিরা বলে এই গ্লাইফোসেট শুধুই আগাছা মারে এবং মানুষ পশু পাখির কোনও ক্ষতি করে না। এটা মিথ্যা। মানুষ, জন্তু জানোয়ার কীট পতঙ্গ এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু নিয়ে প্রাণী জগতে যে সাতটি শ্রেণী বা পরিবার আছে, তার সব কটির সব জীবন্ত প্রাণের গুরুতর ক্ষতি করে এই দীর্ঘস্থায়ী তিলে তিলে মারার বিষ। আমাদের শরীরে যে চার প্রকার অণু আছে - নিউক্লেইক অ্যাসিড (DNA, RNA), প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট (চর্বি, তেল), এইসব কটাকে হয়রানি, বিনষ্ট, আক্রমণ, প্রভাবিত, অকার্যকর, ত্রুটিপূর্ণ বা রোগের বাহক করতে ওস্তাদ এই গ্লাইফোসেট।

সরকার নিজে থেকে বা স্বাধীন কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে এই মারাত্মক পদার্থর নিরাপত্তা বা অপকারিতার কোনও পরীক্ষা না করিয়ে, কোম্পানির কথায় এবং তাদের দেওয়া পক্ষপাতদুষ্ট কাগজপত্রর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দেশের শত কোটি লোকেদের এই বিদেশীর লাভজনক বিষের ওপর নির্ভরশীল করেছেন এবং দেশের মানুষ, পশু পাখি জল, স্থল, বায়ু ও আবহাওয়া সমস্ত কিছুকে দূষিত ও বিষাক্ত করার প্রয়াসে নেমেছেন। বিদেশে পড়া বা তাদের নির্মিত শিক্ষায় তকমা পাওয়া কিছু কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশে এসে বড় বড় দুর্বোধ্য কথা বলে দেশের লোকেদের এবং অগভীর দুর্ভাগা রাজনীতিজ্ঞদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে দেশের মাটিতে এই বিষ ঢালার ব্যাপক ব্যবস্থা করেছে। কোম্পানির দালালরা প্রয়োজন মত সরকারের বড় সাহেবদের তোষামোদের ব্যবস্থা করতেও পিছু পা নন।

সারা দেশে রোগ ব্যাধি, জন্ম ত্রুটি দিনে দিনে বাড়ছে। সামনে ঘন অন্ধকার। এর থেকে উদ্ধার পেতে গেলে সাধারণ মানুষদের হয়তো কোমর বেঁধে নামতে হবে। আপনারা সবাই সাবধান।

শান্তনু মিত্র
E-mail : tany.mitra@gmail.com

এসেছিলেন অভ্র চক্রবর্তী, বিশিষ্ট জৈব চাষি রফিকুল আলম সাহানা। শেখালেন কিভাবে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

এসেছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অসিত চক্রবর্তী শুনিয়েছিলেন ভারতীয় কৃষির ইতিহাস। প্রথম বছর, নতুন করে শেখা, তবুও জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদন মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। নামমাত্র খরচে যতটা উৎপাদন হয়েছিল, সেই পরিমাণ টাকায় ওই জমির জন্য কীটনাশকও কেনা যেত না। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কৃষির মজুরি যোগ করলে আট ভাগের এক ভাগ জমিতেও চাষ করা যাবে না।

'কালাভাত' ধান বিক্রীর সমস্যা

জৈব চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষক হয়তো জমির উর্বরতা ফিরে পাবেন, কিন্তু চাষ করে যদি কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তখন তাঁরা চাষাবাদ করবেন কেন? 200 বিঘা জমিতে উৎপন্ন "কালাভাত" ধান বিক্রি করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন কৃষকেরা।

ওই কালাভাতের ধান কেনার জন্য DRDC'র Project Director এবং Dy Project Director (Credit) যথাক্রমে শ্রীসুকুমার বৈদ্য ও শ্রীসুশান্ত পাত্র মহাশয়ের উপস্থিতিতে, বাঁকুড়া জেলার কৌশিক মাইতির সাথে কৃষকদের একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী কৌশিক মাইতি গ্রাম থেকে 3500 টাকা কুইন্টাল দরে ধান কিনবেন। পরিবহন খরচ ক্রেতার।

কিন্তু কৌশিক মাইতি চুক্তির দামে ধান কিনতে রাজি হলেন না। কৃষকেরা বারংবার DRDC অফিসে গিয়ে আবেদন নিবেদন করলেন। দেখছি দেখবো বলে, একটাও ধান বিক্রি না করে DRDC'র অধিকর্তারা বছর পার করে দিলেন। আজও ফল ভোগ করছেন কৃষকরা। বিভিন্ন মানুষের কাছে আবেদন নিবেদন করে কিছু ধান বিক্রি করলেও সব ধান বিক্রি হয়নি। এখনও কৃষকদের ঘরে ছয় টন ধান জমে আছে।

এই চিত্র একমাত্র পুরুলিয়া জেলারই নয়, এই চিত্র গোটা ভারতবর্ষের। কোথাও কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। ফসলের দাম নির্ধারণ করেন আড়তদার মজুতদাররা। মন্ত্রী আমলারা দেখেও দেখতে পান না। অতি বাম থেকে অতি ডান, ভারতবর্ষে বোধহয় লক্ষাধিক রাজনৈতিক দল। তাঁদের কাছে এটাই ভোটের পুঁজি। বাস্তবটা আরও রূঢ়। 70'র দশকে প্রতি কুইন্টাল ধান/গমের দাম ছিল 76 টাকা, 2015 সালে প্রতি কুইন্টাল ধান/গমের দাম হয়েছিল 1450 টাকা, আনুমানিক 19 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই একই সময়ে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে 120 থেকে 150 গুণ, কলেজ শিক্ষকদের 150 থেকে 170 গুণ, স্কুল শিক্ষকদের 280 থেকে 300 গুণ। এই বেতন বৃদ্ধি হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের ফলে। সেই রাজনৈতিক দলগুলোর কৃষক সেল আছে, তাঁরাও নাকি কৃষকদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন। কিন্তু কৃষকের ন্যায্য দাম পাওয়ার অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা আজও নীরব আছেন। আগামী দিনেও বোধহয় থাকবেন।

এইসব দেখে আমার মনে হয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য- কৃষিজমি থেকে কৃষকদের হাটিয়ে বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে কৃষি জমিগুলো তুলে দেওয়া। আর গদি দখলের জন্য কৃষকদের নিয়ে কিছু মেকি আন্দোলন করা।

ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে বিষমুক্ত ফসল ন্যায্য দামে পৌঁছনোর সমস্যা

কৃষক কেন তার উৎপন্ন ফসলের দাম নির্ধারণ করতে পারে না? কেন দাম ঠিক করবেন, আড়তদার, মজুতদাররা? কেন ফসলের সঠিক দাম কৃষক পাচ্ছে না? কেন বহু কৃষক কৃষির থেকে সরে যাচ্ছেন? কেন কৃষক আত্মহত্যা করছেন?

এসবের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গত 7ই মার্চ 2019 রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। সভায় পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন SHG'র মহিলারা তাঁদের কাজের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনিয়েছেন। বেগুনকোদর থেকে এসে বেবী গোস্বামী শুনিয়েছিলেন ফসল বিক্রি না হওয়ায় ব্যথা। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় পুর্ণেন্দু বসু উপস্থিত থেকে সবটাই শোনেন এবং তাঁর বক্তব্য রাখেন। পরবর্তী কালে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বাঁকুড়া জেলার কিছু কৃষক তাঁর সঙ্গে দেখা করে কিছু বিক্রির সুযোগ সুবিধা করতে পেরেছেন বলেই শুনেছি। প্রবাসী ভারতীয় শান্তনু মিত্র তুলে ধরেছিলেন, বিদেশ থেকে আমদানি করা বিষাক্ত ডালের কথা। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে জমির কি ক্ষতি হয়েছে, সেটাই শুনিয়েছিলেন ডঃ অনুপম পাল।

সেমিনারের লক্ষ্য ছিল, কি করলে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন। প্রচুর মানুষ কৃষি থেকে সরে গেলেও আজও কৃষিতেই দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানের জায়গা। এই কর্মসংস্থানকে কি করলে রক্ষা করা সম্ভব? ব্যক্তিগত ভাবে ফোন, ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপ-এর মাধ্যমে অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটা জিনিস পরিস্কার, জৈব ফসল কেনার জন্য ক্রেতার অভাব নেই। অথচ, কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিক্রি হচ্ছে না। মূল সমস্যা জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন যে কৃষক, তাঁকে সাধারণ মানুষ কেউ চেনেন না। প্রতিদিন বাজারে যাঁরা কাঁচা সবজি, চাল, ডাল, মাছ, মাংস নিয়ে বসেন, তাঁরা কেউই কৃষক নন। সবাই হাট থেকে কিনে এনে বিক্রি করে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় অসুবিধা জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফসলের চাকচিক্য থাকে না। ফলে হাটেও সেই ফসল কেনার ক্রেতা ও ফড়ে খুব একটা আসেন না। এলেও দাম দিতে চাননা। সমস্ত মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফসল, কিছুতেই আঞ্চলিক বাজারে পৌঁছতে পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন, যাঁরা জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন বিষমুক্ত খাবার কিনতে চাইছেন, তাঁদের সঙ্গে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এটা কোন সেমিনার বা মিটিং করে সম্ভব নয়। সম্ভব কৃষকের নাম, ঠিকানা, ফোন নং, সম্ভব হলে ফটো দিয়ে একটা অর্গানিক ফার্মার্স ডাইরেক্টরি তৈরি করা।

নয়ের দশকেই কৃষির সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্পর্কটা বিছিন্ন হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে এসেছে ব্রান্ডেড চাল, ডাল, তেল, মশলা ইত্যাদি। সেই সকল সামগ্রী কোথায় উৎপন্ন হয়েছে, কোন চাষি উৎপাদন করেছেন, কতটা রাসায়নিক সার নামক বিষ প্রয়োগ করেছেন, তার কোন হদিস পাওয়ার উপায় নেই। প্রতিটি প্যাকেট রাসায়নিক পরীক্ষা করলে, ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। টিভি, রেডিও, পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঝুড়ি ঝুড়ি অর্ধসত্য ও মিথ্যা কথা দেখাচ্ছে ও শোনাচ্ছে। আমরা সবাই সেই বিজ্ঞাপনকে বিশ্বাস করে বিষাক্ত খাবার খাচ্ছি।

আমার মনে হয়, জৈব কৃষকের কাছ থেকে যদি আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারি, তবে আমরা ক্যানসার, ব্লাড সুগার, কিডনি বিকল ইত্যাদির হাত থেকে নিজেদের অনেকটা রক্ষা করতে পারবো।

জানা অজানা যে মানুষেরা
মানবকল্যাণে সমাজকল্যাণে পরিবেশকল্যাণে
নীরবে জীবন উৎসর্গ করেছেন
তাঁদের জানাই আমাদের শ্রদ্ধা

নিয়মিত প্রকাশিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা
নিজে পড়ুন ও অন্যদের পড়ান
অসুখ বিসুখ - 254 লেকটাউন বি ব্লক
(M) : 9038999493 / 8583912006
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য, শ্রমজীবী হাসপাতাল-বেলুড়
(বালি)-এর মুখপত্র
স্বাস্থ্যের বৃত্তে, পাঠক ও এজেন্টদের জন্য
যোগাযোগ ঃ 9830922194/9331012537

একটি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা

সুজয় জানা
E-mail : sujoykh@gmail.com

বিভিন্ন সময়ে কাজের সুবাদে কত জায়গায় গেছি। প্রত্যন্ত এলাকায় গেছি। মানুষজন চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন। দেখেছি সুস্থায়ী চাষ সম্পর্কে মানুষের সচেতনা বাড়ছে। আমি রাঢ়বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহলের চাষিদের গাঁয়ে গেছি। দেখেছি বেশ কিছু জনগোষ্ঠীর বাসস্থান সংলগ্ন পোড়ো-পতিত জমি বা বনভূমি আছে। কিন্তু বনের উপর মানুষের নির্ভরতা তেমন নেই। বনের গাছ বলতে আছে- শাল, পিয়াল, দেবদারু, আকড়, শিরিস, শিশু, খেজুর, আসন- এসব। বন থেকে গরীব মানুষের সংস্থান তেমন আর জোটে না। আগে যেমন বনে শাক-পাতা, ফল-মূল পাওয়া যেত; এখন এসবের বড় আকাল। বেশীর ভাগ বন সবুজ মরুভূমি হয়ে আছে। বনভূমি পোড়ো-পতিত হয়ে আছে।

এক একটি জনগোষ্ঠী সংলগ্ন বিশাল বিশাল বনাঞ্চল পড়ে আছে। সেই বনের ব্যবহারিক অছি হিসেবে আছেন বনবাসী বা জনগোষ্ঠী মানুষ। তাঁরা বংশ পরম্পরায় বনে পশুচারণ করতে পারেন। বনের ফল-মূলের ভোগদখল করতে পারেন। কিন্তু বনের গাছপালার মালিকানা বনদপ্তরের হাতে। দপ্তর বনের দেখভাল করে। গাছের পরচির্যা করে। দরকারে গাছের চারা লাগায়। বন্যপ্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু বনবাসী মানুষের ফলপাতা পেতে অসুবিধে নেই।

আমি দেখেছি, হাজার হাজার বিঘার বনাঞ্চলের আজ তার ভোগদখলের সত্বাধিকারীদের দেওয়ার মতো বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু বনে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যোপযোগী শাক পাতা, কন্দমূল ও ফলের বন্দোবস্ত থাকলে বনের উপর নির্ভর করে মানুষের জীবিকা নির্বাহ হত।

আমার মনে হয়েছে, যদি বনাঞ্চলের কিছুমাত্র অংশ নিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় গাছগাছালি দিয়ে একটি সামাজিক বনসৃজন করে নিই, তাহলে আগামী দিনে বনজ সবুজ সম্পদে একটি জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আমার বিশ্বাস জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের বনাঞ্চল বা ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ীর বনাঞ্চলের সব বনবাসী জনগোষ্ঠীকে আমরা এক একটি খাদ্যবন উপহার দিতে পারি।

আমরা এখন একটি এলাকা নিয়ে এগোই। আসুন, সবাই মিলে একটি বনকে খাদ্যবন রূপে গড়ে তুলি।

সদ্য জেলা হিসেবে চিহ্নিত ঝাড়গ্রাম। পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা এই জেলায় আদিবাসী-ভূমিজদের বাস। বন্ধুর ভূমি। মাটিতে বালি, কাঁকড়, কাদা ও বিচিত্র শিলা পাথরের সমন্বয় চোখে পড়ে। এখানকার কিছু জনজাতি কুড়িয়ে আনা পাথর কুঁদে মূর্তি গড়েন। জলবায়ু রুক্ষ। বেশীর ভাগ জায়গায় এক ফসলী চাষ হয়। এখানে গরীব শ্রেণীর মানুষের বাস।

প্রত্যেকের জমি আছে কম বেশী। এঁদের অধিকাংশ পাহাড়, পোড়ো-পতিত জমি, বন আর জলার উপর নির্ভরশীল। ইদানিং জীবিকার জন্যে মানুষকে স্থানান্তর হতে হচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে এই জনজাতিগুলির স্বনির্ভরতার একটি দিশা দেওয়া যেতে পারে। এই জেলার বন লাগোয়া একটি গ্রামকে মডেল করে আমাদের চিন্তা ভাবনা শুরু হতে পারে।

আমরা বিনপুর দুনম্বর ব্লকের আগুইবিল গ্রামটিকে নিতে পারি। গ্রামে দুটি জনগোষ্ঠীর বাস। সাঁওতাল ও ভূমিজ। এখন ছোট পরিসরে কেবলমাত্র ভূমিজদের এই উদ্যোগ নেওয়া যাক। ভূমিজদের মোট পরিবার 50টি। এঁদের 90 শতাংশের আর্থিক অবস্থা অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সকলের কম বেশী জমি অছে। বর্ষা নির্ভর চাষ। তাই শুধু চাষ করে সংসার চলে না বলে জীবিকার জন্যে প্রায় সকলে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন।

আগুইবিলের ভূমিজরা বংশ পরম্পরায় পাশের পাহাড়, বন ও জলা থেকে জীবন জীবিকার রসদ সংগ্রহ করে আসছেন। বন থেকে পাতা, জ্বালানি, বন আলু, মোল ফুল ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করেন এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলিতে তাঁদের ভোগ দখলের স্বত্ব আছে। কিন্তু পাহাড়ে ক্রম বিরল হচ্ছে দরকারী গাছপালা। মানুষের বনের উপর নির্ভরতা কমে যাচ্ছে। যদি আগুইবিলের ভূমিজদের ব্যবহারের পাহাড়, বন ও পতিত জমিতে নানা ধরনের ফলের ও দরকারী গাছ লাগানো হয় তাহলে এঁদের পুষ্টি ও আর্থিক সুরক্ষা বলবৎ হবে। সঙ্গে থাকবে সুস্থায়ী কৃষির বিবিধ উদ্যোগ। দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন ফলের গাছ লাগানো হবে। লাগানো ফল গাছ থেকে ফসল পেতে 5-7 বছর সময় লেগে যাবে। তাই স্বল্প মেয়াদি কৃষিরও ব্যবস্থা থাকবে। এই কৃষি ফসল সাময়িক ভাবে মানুষজনের রান্নাঘর সচল রাখবে। পুষ্টি জোগাবে। উদ্যম বাড়াবে।

ধরি, প্রথমে ভূমিজরা এই মিশনে সামিল হলেন। এখন উদ্দিষ্ট 50 টি পরিবার নিয়ে গঠন করা হবে একটি ''চাষি দল'' বা ''ফার্মার্স ক্লাব''। এই উদ্যোগে প্রতিটি পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মালিকানা গ্রাহ্য হবে। প্রত্যেককে শ্রম দিতে হবে। প্রথমে বাসস্থান সংলগ্ন পাহাড় ও পতিত এলাকায় 12-15 একর জমি নির্বাচন করতে হবে। জায়গাটি গাছ লাগানো ও চাষের জন্য ব্যবহার করতে হবে। বন দপ্তরের লিখিত অনুমতিও নেওয়া দরকার। জায়গাটি গাছের ডাল ও মোটা জাল দিয়ে বেড়া দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে গবাদি পশু ক্ষতি না করে।

With Best Compliments From :

A

Well Wisher

দরকারী বীজ ও উপকরণ ঃ

ক) দীর্ঘমেয়াদি বাগিচা ফসলের জন্য

	বীজের নাম	পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য টাকা	মন্তব্য
1	বেল বীজ	2 কেজি	200.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
2	কাঁঠাল বীজ	5 কেজি	100.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
3	আমের আঁটি	200 টি	200.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
4	হরিতকি বীজ	2 কেজি	100.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
5	বহেড়া বীজ	1 কেজি	50.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
6	আমলকি বীজ	3 কেজি	300.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
7	কাজু বীজ	4 কেজি	550.00	কিনতে হবে
8	বাঁশের চারা	50 টি	--	নিজেদের সংগ্রহ করতে হবে
9	লেবু	200 টি	2500.00	সংগ্রহ করা যেতে পারে
		মোট	4000.00	

খ) স্বল্প মেয়াদী কৃষি খন্দের জন্য ঃ

	বীজের নাম	পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য টাকা	মন্তব্য
1	ভেন্ডি	1 কেজি	700.00	
2	বরবটি	1 কেজি	600.00	
3	করলা	2 কেজি	800.00	
4	ঝিঙ্গে	2 কেজি	800.00	
5	কুমড়ো	1 কেজি	500.00	
6	হলুদ	10 কেজি	500.00	
7	আদা	20 কেজি	1000.00	
8	কচু	25 কেজি	600.00	
9	ওল	25 কেজি	1000.00	
10	খামালু	10 কেজি	400.00	
11	শাকালু	3 কেজি	600.00	
		মোট	7500.00	

সাকুল্যে 11500 টাকা খরচ হবে। এছাড়া বেড়া দেওয়ার জন্য জাল দড়ির খরচ আছে। বাঁশ গাছের চারা সংগ্রহ করতে হলে আলাদা খরচ হতে পারে।

জনগোষ্ঠীর সাথে বসে ঠিক করতে হবে এই মিশনকে সফল করতে আর কী কী করা উচিত। আর কী গাছ লাগানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন ওঁরা। ওঁদের পরামর্শ নেওয়াটা খুব জরুরী।

মিশনটি সফল করতে 50 টি পরিবারকে 5 টি দলে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি দল থেকে একজন করে নির্বাচিত দলপতি ফার্মার্স ক্লাবের মূল কমিটির হয়ে কাজগুলি দেখভাল করবেন। প্রাথমিকভাবে এই ক্লাব রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই। বর্ষার আগে 50 টি পরিবারকে সমবেতভাবে ফলের বীজগুলি লাগাতে হবে। বনের মাটি ও প্রকৃতি অনুযায়ী ফল গাছ ঠিক করতে হবে। যেমন বেল বীজ লাগানো হবে উঁচু রুক্ষ পাথুরে মাটিতে কিন্তু কাঁঠাল বীজ লাগানো হবে অপেক্ষাকৃত নরম ও সরস মাটিতে। সবজি বীজগুলি লাগাতে হবে 5 টি দলে ভাগ হয়ে দলগতভবে। লাগাতে হবে ঐ সুরক্ষিত জায়গার মধ্যে। 5 টি দলের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জমি খণ্ডে চাষ করবেন। সবজি চাষে জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বর্ষায় সবজি চাষ খুব ভাল হবে। রবিতে বা প্রাক খরিপে করতে হলে জলের প্রয়োজন। যা আপাত ভাবে সম্ভভ হবে না। কিন্তু সেচ লাগবে না এমন কিছু ফসল করা যেতে পারে। এছাড়া ওল, কচু, আদা, হলুদ, খামালু ইত্যাদিতে সেচ লাগে না।

ফল গাছগুলির পরিচর্যার জন্য ফার্মার্স ক্লাবকে সচেতন হতে হবে। এলাকার মানুষের শীতের সময় বনে আগুন দেওয়ার পুরনো রীতি আছে। বনে আগুন ধরানো থেকে মানুষকে বিরত করতে হবে। শীতের সময় বনে 2-3 বার ঝাঁট দিয়ে শুকনো পাতা বাকল নীচে নামিয়ে আনতে হবে। এগুলি গৃহস্থের জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগবে। নাহলে জড়ো করে জৈব সার করা যাবে। আগামী গ্রীষ্মে চারাগুলি বাঁচাতে কলসী সেচের ব্যবস্থা থাকবে। 50 টি বাঁশের চারা লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারকে একটি করে ঝাড় আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। এছাড়া সজনে ডাল, তেঁতুল, আমড়া, আনারস চারা, অড়হর প্রভৃতি দরকার মত সমবেত বা দলগত ভাবে লাগানো যেতে পারে। এক বছর পর ফার্মাস ক্লাব বসে ঠিক করবে বনের আসন গাছে রেশম চাষ করা যায় কিনা। রেশম চাষে লাভ বেশী। কিন্তু বনকে সম্পদে পরিণত করতে হলে ফলের চারাগুলি আগে বড় করা জরুরী।

এই সবুজায়নে যাতে বনের পুরনো গাছ না কাটা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুধু পতিত ভূমিকে কাজে লাগানো হবে। আমাদের মনে হয়েছে এই ধরণের প্রচেষ্টায় ক্রম হতমান একটি জনগোষ্ঠী বরাবরের জন্য স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে।

মাঠে যাওয়া

সুমিত চক্রবর্তি
E-mail : sumitbalai@gmail.com

[রচনাটি প্রকাশের জন্য বিবেচনা করতে বসে বৈঠকে উপস্থিতদের কাছ থেকে এলো বহু বহু প্রশ্ন, বিতর্কই দেখা দিল। একপক্ষের মতের সারাংশ-লেখাটিতে সভ্যতার পিছু হঠার সাফাই দেওয়া হয়েছে। স্যানিটেশনের প্রথম ধাপই ছিল উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন, এতে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতএব প্রকাশ করা যায় না। অপর পক্ষ বলতে চান, পেছনে ফেলে এসেছি বলেই কোন কিছুকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে ফিরে দেখতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে শেখার অবশ্যই আছে। লেখাটি তেমন একটি মত হিসেবেও যদি প্রকাশ না করি, তাহলে সেটা হবে দমনমূলক। পাঠকের ওপরেই ছাড়া ভালো।-সঃ মঃ]

বিভিন্ন লোক অভ্যাস এবং আধুনিক যুক্তি ঃ চালু ধারণা হল মাঠে পায়খানা করা খারাপ। এতটা খারাপ যে 'এই নিয়ে আবার অন্য কথা হতে পারে নাকি!' মানুষজনের ভাব অনেকটা এই রকম। আমার দাদু কর্মসূত্রে বাঁকুড়ায় ছিলেন কিছু দিনের জন্য। মা মাসির কাছে শুনেছি কেউ পায়খানায় হাগে শুনলে ওখানকার মানুষ 'ওরা গুয়ের উপর হাগে' বলে ঘৃণা প্রকাশ করতেন, তাদের এলাকায় পায়খানা তৈরিতে বাধা দিতেন। বন্ধুর কাছে শুনেছি ছোট বেলায় দিদিমার সঙ্গে মাঠে যেতাম। সাথে দিদিমার অন্য অনেক সঙ্গিনীও যেতেন। পায়খানা হয়ে গেলে সকলে এক যায়গায় জড়ো হয়ে অনেক্ষণ গল্প গুজবও করতেন। পরে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু এলে মাঠ বেদখল হয়ে যায় এবং সেই সুযোগ আর তাঁদের ছিল না। শুনেছি এতে তাঁদের মানসিক সমস্যাও হয়েছিল। বছর ছয়েক আগে নর্মদা নদীর তীরে ঋণ মুক্তেশ্বর মহাদেবের মঠে গিয়েছিলাম। মঠে কোনো ঘর পায়খানা ছিল না। সকলেই খোলা জায়গায় যান। আশ্রমের প্রধান নর্মদনন্দজি বলেছিলেন ঘর পায়খানা বানালেই মশা হবে। যেখানেই ঘর পায়খানা, সেখানেই মশা। অন্যদের মত আমরাও ওখানে মশারী ছাড়া ঘুমিয়েছি। কোনো সমস্যা হয় নি।

সুষ্ঠু ভাবে খোলা জায়গা ব্যবহার ঃ সরকার পায়খানা বানিয়ে দেয়ার পরেও বহু মানুষ দুর্গন্ধ, অপরিচ্ছন্নতা আর বদ্ধ হওয়ার কারণে ঘর পায়খানায় না গিয়ে মাঠে যায়। বলা হয়ে থাকে, মাঠে পায়খানা করলে অসুখ বিসুখ ছড়ায়, আর এটা অসভ্যতা। প্রথমত বলে নেয়া যাক যারা ট্রেকিং এ যায় বা পাহাড়ে উঠতে যায় সম্ভবত বেশিরভাগ সময়ই তাদের খোলা জায়গায় পায়খানায় যেতে হয়। পায়খানা বলতে যদি আমরা আড়াল এবং পরিচ্ছন্নতা বুঝি দুটির ব্যবস্থাই খুব সুষ্ঠুভাবে খোলা জায়গায় করা সম্ভব। গাছ দিয়ে বা গ্রামাঞ্চলে চালু নানারকম বেড়া দিয়ে আড়াল তৈরি করা যায়। অন্ধকার রাত্রি এবং ফাঁকা নির্জন জায়গার প্রেক্ষিতও একধরণের আড়াল তৈরি করে যা উপক্ষেণীয় নয়। আর পরিচ্ছন্নতার জন্য পায়খানাকে ঢেকে দেয়া প্রয়োজন। এজন্য মাটি, ছাই, পাতা, কাগজ এরকম নানা জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি একটি ছোট

কোদাল দিয়ে ছোট্ট গর্ত করে সেখানে পায়খানা করার পর মাটি চাপা দেয়া যেতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই সকলেই খেয়াল করেছি বিড়ালও পায়খানা করে ঢেকে দেয়। বস্তুত পায়খানা করে ঢেকে না দেয়া রুচি হীনতার পরিচয়, এটা একটা দন্ডনীয় অপরাধ। ঢেকে দেয়ার ফলে, ক) মল দেখা যায় না। এতে দৃশ্যদূষণ হয় না, চোখের পীড়া হয় না। খ) দুর্গন্ধ ছড়ায় না, গন্ধদূষণ হয় না। গ) এর উপর মাছি বা অন্যান্য পতঙ্গ বসতে পারে না ফলে রোগ ছড়ায় না। ঘ) দ্রুত পচনক্রিয়ায় মল মাটিতে মিশে যায়, জৈব সার তৈরি হয়। মানুষ প্রকৃতি থেকে যা গ্রহণ করে এভাবে অতি উত্তমরূপে তা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দিতে পারে।

শুকর পালনের সাহয্যে খোলা জায়গায় মল ত্যাগঃ শুনেছি বোকারো লোহা কারখানা যখন তৈরি হয় হাজার হাজার মজুর কাজ করতেন। তাঁরা খোলা জায়গায়ই মল ত্যাগ করতেন। এবং তাঁদের পোষা শুকর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো পরিস্কার করে ফেলত। 2004 সালে উড়িষ্যার রায়গড়া জেলায় গেছিলাম। সেখানকার পাহাড়ে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইট ছিল। রাষ্ট্রের সাহয্যে বহুজাতিক কোম্পানি ওখানকার সম্ভবত 85টা গ্রামের 25 হাজার মানুষকে উৎখাৎ করে বক্সাইট খননের চেষ্টা চালাচ্ছিল। ওখানকার ভূমি সন্তানরা প্রতিরোধ রচনা করে সেই সময় অব্দি 12 বছর ধরে বহুজাতিক কোম্পানিকে ওখানে ঢুকতে দেন নি। অরুন্ধতী রায় তাঁর বুকার পুরস্কারের পুরো টাকাটাই বিভিন্ন জায়গায় দান করেছিলেন। এঁদেরও দিয়েছিলেন দুই লক্ষ টাকা। এই গ্রামে কোনো ঘর পায়খানা ছিল না। মাঠ, জঙ্গলে, পাহাড়েই এঁরা যেতেন। রাত বিরেতে পায়খানা পেলে এঁরা দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে যেতেন না, গ্রামের মধ্যেই খোলা জায়গায় এমনকি একেবারে রাস্তার মধ্যে মল ত্যাগ করতেন। তাঁদের পোষা শুকরগুলি মুহূর্তের মধ্যেই সেসব পরিস্কার করে ফেলত, তার কোনো চিহ্ন থাকতো না। অরুন্ধতী রায় এই গ্রামে এলে তাঁর জন্য একটা চিনে মাটির প্যান বসানো হয়। শহরের লোক গ্রামে গেলে গ্রামকে শহর বানিয়ে তোলেন। সেটা না করে গ্রামের লোকের কাছ থেকে গ্রামীন জীবন শৈলী শেখার চেষ্টা করলে সকলেরই উপকার হতো। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি শুকর পালনের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ঘন বসতি এলাকাতেও খোলা জায়গায় মল ত্যাগের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। একটা ঘেরা জায়গায় মাঝামাঝি বেড়া দেওয়া যেতে পারে যার মধ্যিখানে দরজা থাকবে। এই বেড়ায় একদিকে লোকে পায়খানা করবে অন্য দিকে শুয়োর থাকবে। পায়খানা করা হয়ে গেলে মধ্যের দরজা খুলে দিলে শুয়োর এদিকে চলে এসে মল পরিস্কার করে ফেলবে। তখন মধ্যের বেড়ার দরজা আটকে অন্য দিক মল ত্যাগের জন্য ব্যবহার করা হবে। এরকম নানা পরিকল্পনাই করা যেতে পারে।

খোলা জায়গায় মল ত্যাগ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যঃ প্রকৃতিতে জীব তৈরি হয়। তার শরীরের সমস্ত বর্জ্য, অবশেষে তার শরীরটাও মৃত্যুর পরে প্রকৃতিতে মিশে যায়। একারণে সেখানকার প্রকৃতির কোনো ক্ষয় হয় না। একারণেই বন জঙ্গলের উর্বরতা কখনো কমে না, অথচ অসংখ্য গাছ সারা বছর ধরে সেখানকার মাটি থেকে পুষ্টি নিতে থাকে। আজকের কৃষি কার্যত খনির মত একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খনি থেকে মানুষ খনিজ উত্তোলন করে। এই খনিজ

আর কখনো আগের জায়গায় ফিরে যায় না। প্রকৃতি ক্রমে রিক্ত হতে থাকে। একসময় সেখানে আর খনিজ পাওয়া যায় না, নতুন খনির সন্ধান করতে হয়। কৃষিজ ফসলও জমিতে ফিরে যায় না। বৃহত্তম ভোক্তা মানুষ তাকে জমি থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়, জমির উর্বরতা কমতে থাকে। আগে একটা জমিতে বছরে একটা কখনো দুটো চাষ হত। ফসল অনেকটাই স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হত। ফসল না থাকলে মাঠে গবাদিপশু চরত। তারাও মাঠে ঘাটে পায়খানা পেচ্ছাপ করত। তারা মারা গেলে তাদের শরীর মাঠে ফেলা হত। মানুষও অনেকাংশে মাঠে ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করত। ফলে জমি কম রিক্ত হত। তবুও উর্বরতা কিছুটা কমত আর সেজন্য মাঝে মাঝে জৈব সার দেয়ার চল ছিল। আজ পণ্য ফসলের যুগে ক্রমশই জমিতে বেশি বেশি চাষ হচ্ছে। জমি ফাঁকা পড়ে থাকে না। উপভোক্তারা দূর বহুদূর এমনকি ভিন্ন দেশ বা মহাদেশের বাসিন্দা। শহরের বাসিন্দা। মানুষও মাঠে ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করছে না। গাছ জমি থেকে যা নিয়েছিল তা জমিতে ফিরে আসা কার্যত অসম্ভব হয়ে গেছে। জমির রিক্ততা আজ সীমাহীন। অজৈব সার দিয়ে ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগানর চেষ্টা চলছে কিন্তু ফসলের মান আর পরিমাণ ক্রমশই নিম্নমুখি। জৈব চাষের শর্ত হলো গাছ জমি থেকে যা পেয়েছিল তা জমিতে ফিরে আসতে হবে। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত জমিতে জৈব চাষ কার্যত অসম্ভব।

তখন ক্লাস টেন-এ পড়ি। আমাদের সাথে যে পরীক্ষায় প্রথম হত সে একবার ক্লাসের মধ্যে বলেছিল অজৈব সারে তৈরি ফসল জৈব সারে তৈরি ফসলের চেয়ে নিম্নমানের। সে সময়ও এটাই চালু সামাজিক ধারণা ছিল। শিক্ষক তাকে বলেছিলেন, তপন, তোমার কাছ থেকে এরকম কথা আশা করি নি। বিজ্ঞান দিয়ে আমরা বুঝতে পারি গাছ জমি থেকে কি নিয়েছে, গাছের কি প্রয়োজন। রাসায়নিক সারের মধ্য দিয়ে গাছকে আমরা সেগুলোই দিই, তাহলে রাসায়নিক সার দিয়ে তৈরি ফসল নিম্নমানের হবে কেন। আজ অবশ্য রাসায়নিক সার সম্পর্কে এরকম অন্ধ বিজ্ঞান বিশ্বাস কম দেখা যায়।

সমস্ত প্রাণীর শরীর গাছ দিয়ে তৈরি, গাছই একমাত্র যে খাবার তৈরি করতে পারে। বস্তুত প্রকৃতিতে তৈরি গাছ প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার পথে নানা রকম রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। গাছ থেকে খাবার পেয়ে তৈরি প্রাণী শরীর সেরকম একটি রূপ মাত্র। সুতরাং প্রাণীজ বর্জ্য এবং প্রাণী শরীর প্রকৃতিতে অর্থাৎ জমিতে ফিরে আসা জরুরি। প্রাণীরা মাঠে জঙ্গলে মলত্যাগ না করলে গাছ জমি থেকে যা নিয়েছিল তা জমিতে ফেরা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। এবং জৈবচাষ সোনার পাথরবাটি হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় জৈব সার প্রয়োগ করে খুবই সীমিত জমিতে জৈব চাষ সম্ভব হতে পারে, ব্যাপকভাবে কখনই নয়। অন্যথায় পায়খানার মলকে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ জটিল প্রক্রিয়ার জমিতে নিতে হয়।

বাথরুম এবং ঘর পায়খানার বিপদ ঃ একটি ছেলের সাথে কথা বলতে যেতাম কল্যাণীতে। ঠাকুরমাকে খুব ভালো বাসত। কলকাতায় তিনি তাঁর ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মারা যান ঠাকুমা। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। আজও ছেলেটির দুঃখ যায় নি। বাথরুমে পড়ে গিয়ে ডাক্তার দিদির মায়ের একটা পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল বহু বছর আগে। যথাযথ

চিকিৎসা হয়েছিল। আজও তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটেন। পা টা সামান্য ছোট হয়ে গেছে। উঁচু নিচু জায়গায় হাঁটতে গেলে মাঝে মাঝেই পড়ে যান। বিখ্যাত মনোসমীক্ষক ড. সান্যালের এক মহিলা ক্লায়েন্ট, চালু কথায় রোগী, বাথরুমে পড়ে গিয়ে ভয়বহ ভাবে জখম হয়েছিলেন। বোধহয় ছয় মাসেরও বেশি শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। ড. সান্যাল তাঁকে বলেছিলেন, আপনার অবচেতন মন আসলে দীর্ঘ বিশ্রাম চেয়েছিল। তালিকা আরো বাড়িয়ে তোলা যায়...। বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে কত লোক আহত বা নিহত হয় তার কোনো পরিসংখ্যান সম্ভবত পাওয়া যাবে না। খোঁজ নেয়া গেলে হয়তো দেখা যেত পথদুর্ঘটনা, হত্যা, আত্মহত্যা জনিত মৃত্যুর চেয়ে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কম না। এবং সাপের কামড়ে মৃত্যু, বজ্রপাতে মৃত্যু এসবের চেয়ে বাথরুমে পড়ে জখম এবং মৃত্যুর সংখ্যা হয়ত বেশি। মানুষ মাঠে জঙ্গলে পায়খানায় গেলে এই বিপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। এর সাথে চান, বাসন মাজা, জামাকাপড় কাচার মত কাজগুলি যদি পুকুর বা জলাশয়ে করা যায় জল সমস্যাও অনেকটাই কমে, কারণ জলাশয়ের জল এভাবে খরচ করলে কমে না। এতে বাথরুম এবং জলের জন্য শিল্পের প্রয়োজন কমে। নর্দমার প্রয়োজন কমে, শিল্পায়ণ জনিত হিংসা ও দূষণ থেকেও অনেকটাই মুক্তি পাওয়া যায়। সাথে সাথে জীবনের অনেকগুলো প্রয়োজন অর্থব্যয় ব্যতিরেকে মেটে। শক্তির খরচও কমে।

উপস্থিত করণীয় ঃ যাঁদের খোলা জায়গায় মল ত্যাগের সুযোগ আছে তাঁদের অবশ্যই খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করা উচিত। অবশ্যই তার জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে এ জন্য কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন। সেখানে শেখানো হবে কি করে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে, এবং রুচিশীল উপায়ে খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করতে হয়। যাঁদের হাঁটু বা কোমরের সমস্যার জন্য কমোডের প্রয়োজন, তাঁদের জন্য মধ্যে ফাঁকা চেয়ার বা টুলের ব্যবস্থাও খোলা জায়গায় থাকতেই পারে। আর যাঁদের নিতান্তই খোলা জায়গায় যাওয়া সম্ভব না তাদের জন্য প্রাথমিক ভাবে 'আধুনিক' ঘর পায়খানার ব্যবস্থা থাকতে পারে, ক্রমশ হয়তো তাঁরা প্রাকৃতিক এবং গ্রামীণ জীবন শৈলী রপ্ত করে নেবেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটিগুলি যদি কার্যকর ভাবে পুকুর এবং জলাশয়গুলি পরিষ্কার করা এবং পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে চান করা, জামাকাপড় কাচা এবং বাসন মাজার কাজও সুন্দরভাবে চলে। এতে মানুষের সাথে মানুষের মেলামেশার সুযোগ বাড়ে এবং অন্য অনেক সমস্যার সাথে সাথে জল সমস্যারও সহজ সমাধান হয়।

পুস্তক পর্যালোচনা

ছড়াতে ছবিতে আত্মঘাতী সভ্যতার বিবরণ

ধ্রুবজ্যোতি দে
E-mail : dedhruba@yahoo.co.in

এই বিপন্ন সময়ে, পরিবেশ প্রকৃতি যখন বিপর্যয়ের মুখে, আমরা, বিড়ম্বিত মানুষজন, ছড়িয়ে পড়া খইয়ের মতন কেবলই উড়ছি, ঘুরছি, হারিয়ে যাচ্ছি শহুরে সভ্যতার অলি-গলি-রাজপথে, ইঁট-পাথরের জঙ্গলে। আবার একই সঙ্গে খুঁজে চলেছি অবিরাম সুখ-আরাম-বিলাস। একের পর এক গড়ে তুলছি বহুতল, শেষ করছি ভূ-গর্ভের জল, বুজিয়ে ফেলছি জলাভূমি, বাতিল করছি পরিবেশ-বান্ধব বাহন, ভার্চুয়াল নেশায় বসাচ্ছি মোবাইল টাওয়ার, ডেসিবেল ছাপানো হট্টগোল করে ভাবছি আনন্দ করছি। এদিকে আমাদের শস্যে-আনাজে কখন মিশছে কীটনাশক, বাতাসে বিষ-ধোঁয়া, মাটিতে প্লাস্টিক কণা, পানীয় জলে আর্সেনিক, তা আমরা বুঝতেও পারছি না। জানতে যখন পারছি তখনও চোখ বন্ধ করে ভাবছি, এই বেশ ভাল আছি। কিন্তু কোন এক শরতের সূর্যসোনা আলোয় কিম্বা ঠা ঠা গ্রীষ্মের মধ্যদিনে যদি কখনো পৌঁছে যাই সবুজ ঘাসের গালিচায়, তেঁতুল গাছের ছায়ায়, কলমিপুকুরের ধারে, শাল সেগুনের বনে, কেবল তখনই বুঝতে পারি আমরা ক্রমাগত কি হারিয়ে চলেছি।

কবি কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সবুজ ঘাসের উড়ো খই' বইতে অজস্র ছড়ার আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এইসব ছবি। কেবল নদী-জল-মাটি-বাতাস নয়, শালিক, চড়ুই, বুলবুলি, পোকা-মাকড়, পরিযায়ী পাখি, পথের কুকুর থেকে খাবারের খোঁজে জনপদে চলে আসা গজরাজ, সমগ্র জীবজগত ও উদ্ভিদ নিয়ে আমাদের যে প্রতিবেশ, তার ক্রমিক নির্মূলন ব্যথিত করে কবিকে। এই ছড়া সংকলনটি পড়লে অনুভব করা যায় পেশায় বাস্তুকার হলেও, পরিবেশ প্রকৃতি বিধ্বংসী নগরায়নের নামে ঘটে চলা ভ্রান্ত উন্নয়ন থেকে ছড়া ও ছন্দকে অবলম্বন করে নিস্তার খুঁজেছেন ক্ষুব্ধ কৌশিক। কবির ভাষায়, 'সবুজকে গিলে খেয়ে শহরের কলেবর, বেড়ে যায় - ভাবে মনে হয়ে গেছি তালেবর'। আর একটি ছড়ায় তিনি বলছেন, 'এ কেমন প্রগতি/ ছেড়ে দিয়ে সুমতি- / আত্মঘাতের পথে সভ্যতা রসাতল?' কৌশিকের কথনেই বলি, 'ধরণীর ধারণ ক্ষমতার ওপরে দীর্ঘকালীন অবিচার সত্ত্বেও, তার সহনশীলতার সীমা অতিক্রমের অসহায়তা' যখন বর্তমানে ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশিত, তখন তাঁর ছড়াগুলি আমাদের ভাবায়, উদ্বুদ্ধ করে, মনে উদ্ধার বাসনা জাগিয়ে তোলে, ক্ষণিক হলেও চেতনায় মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। কিন্তু কে এনে দেবে সেই স্থায়ী পরিত্রাণ? কবি লেখেন, 'ভুবন জুড়ে মুক্তধারা / লোভের গ্রাসে জীবন হারা! / কার কাছে সেই সোনার চাবি? / তাই উঠেছে ছোটর দাবি'। যথার্থ অভিলাষ। বসুন্ধরাকে রক্ষার জন্য আজ যখন দেশে দেশে কিশোর-কিশোরী পথে নেমে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন তখন আশা জাগে বৈকি।

'সবুজ ঘাসের উড়ো খই' বইটি মোট 38টি ছড়ার সংকলন। প্রচ্ছদ-শিল্পীঃ শান্তনু সেন। প্রতিটি ছড়ার সাথে সঙ্গত করেছে হাল্কা চালে আঁকা কার্টুনধর্মী

রেখাচিত্র- শিল্পী সুস্মিতা ও সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিগুলির সারল্য আমাদের অসহায় মনকে ভারমুক্ত করে। ছড়া ও তার ছবি সম্পর্কে বইটির ভূমিকায় শিশুসাহিত্যিক শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, (ছড়াগুলিতে) 'কবির কটাক্ষ অলঙ্করণের প্রলেপে ঢাকা নয়। আবরণ মুক্ত করে ছন্দ-মিলের সহজ সহাবস্থানে তা সংস্থাপিত'। বইটির জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। কবি বইটি প্রয়াত পরিবেশকর্মী ও শিল্পী শ্যামলী তান খাস্তগিরের স্মৃতিতে ছোটদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। সুমিত্রা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 6 x 8.5 ইঞ্চি শক্ত বাঁধাইয়ের 52 পাতার এই ছড়া সংকলনটি বেশ নয়ন শোভন। বইটির মূল্য 135 টাকা।

With Best Compliments From :

A I M B E E

36/1/1/2D, Pulin Khatick Road, Kolkata - 700 015

Contact No. : 9330446711 / 9477570629

Service for

Pest Control ♦ Dusting & Cleaning ♦ Book Preservation ♦ White Ant Treatment ♦ Termite Control

Reference :

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office and Others)

Colleges (Libraries & Laboratories)

Banks

Central & State Government Offices

সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান সাময়িকী

কালধ্বনি

যোগাযোগ : 2/1এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা - 700 009

ইমেল : kalodhvani@yahoo.co.in, M : 9830227186

বিওবি'র 'আত্মপ্রচার-মূলক' বিজ্ঞাপনের একটি অপ্রকাশিত খসড়া প্রস্তাব

[বিগত শতকের সত্তর-আশি-নব্বই-এর দশকে যখন আমাদের পত্রিকা রীতিমত একটি আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র তখন নিরন্তর প্রশ্ন উঠতো আমাদের নিজেদেরই মধ্যে কেন, কি এই বিওবি, কি করতে চাই আমরা ইত্যাদি। সেই সময়েই আমাদের একজন এই বিজ্ঞাপনী খসড়াটি লিখেছিলেন। এতদিন তা অজানাই ছিল। জানার পর মনে হল এর রসাস্বাদনে পাঠকদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। - সঃ মঃ]

'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানকর্মী' (বি-ও-বি)

1 'বিজ্ঞান' যেখানে জীবনকে স্পর্শ করছে তাই নিয়েই বি-ও-বি'র কারবার।

2 বি-ও-বি'তে বিজ্ঞান ও জীবনের যুগপৎ প্রতিফলন।

3 বি-ও-বি'র প্রতিটি সংখ্যাতেই চেষ্টা থাকে রসের ভোজ বানান'র
- টক-মিষ্টি-তেতো, শুধু মিষ্টি রসের নয়
- বিজ্ঞানের রস, জীবনের রস, বিজ্ঞান-সমাজ স্পর্শ তলের ভোজ- এই রসের ভোজে বি-ও-বি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে; অতিথি হিসেবে নয়, সাথী হিসেবে।

4 উচ্চ পাদপীঠ থেকে জ্ঞানের আলো ছড়ান'র মূঢ় উদ্ধত দাবী নিয়ে নয়, আলো আঁধারে ঘেরা আমাদের জীবনকে ও তার অভিজ্ঞতাকে সবার সাথে ভাগ করে নেওয়াই বি-ও-বি'র লক্ষ্য।

5 পাঠক ও লেখকের মধ্যে 'জ্ঞানের দেওয়াল' তোলা নয়, সেই দেওয়ালের জন্ম না হতে দেওয়াই বি-ও-বি'র লক্ষ্য।

6 'আলোকিত' করার পাদ্রীসুলভ মানসিকতা নয়, সবাই মিলে আলোর উৎস খোঁজাই বি-ও-বি'র লক্ষ্য।

7 প্রাপ্ত সীমিত জ্ঞান-এর বিতরণ নয়, সবার সাথে তা ভাগ নেওয়া ও একই সাথে তার সন্ধানই বি-ও-বি'র লক্ষ্য।

8 বি-ও-বি'র ভাবনায় 'সত্য' চরিত্রগত ভাবেই এক রঙা নয়- রামধনু রঙা। বি-ও-বি'র পাতাকে সেই রামধনু রঙের একটি দর্পণ করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা থাকে।

9 'বিজ্ঞান' পত্রিকা হলেও সত্যের একচেটিয়া মালিকানাসত্ত্বের কোন দাবী বি-ও-বি'র নেই।

10 'নির্ভুলতা'র বা 'শেষ কথা' বলার কোন মূঢ় দাবী নিয়ে নয়, নিজেদের ভুল শোধরানর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করে যাওয়াই বি-ও-বি'র লক্ষ্য।

11 'বিজ্ঞান'-কে 'বিশেষজ্ঞের' গুপ্ত বিদ্যার অন্ধকার কুঠরী থেকে গণ-দৃষ্টি'র প্রকাশ্য দিবালোকে অনাবৃত করা বি-ও-বি'র অন্যতম লক্ষ্য।
- আপনিও আসুন, তার অংশীদার হোন।

12 এক রঙ্গা নানা 'নিশ্চিত সত্যের' দাবীদার নানা গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার জায়গায় 'চিরনিশ্চিয়তার' দাবীহীন নানা রঙের 'সত্যে'র সুস্থ আদান-প্রদানের (তর্ক-বিতর্কের বিপরীতে) সুযোগ সৃষ্টি করা বি-ও-বি'র অন্যতম লক্ষ্য। এই কাজে বি-ও-বি আপনার সহযোগিতা কামনা করে- পাঠক হিসেবে, লেখক হিসেবে, সমালোচক হিসেবে।

13 বি-ও-বি কোন অন্ধ অনুগামী বা প্রশংসাকারী সংগ্রহে উৎসাহী নয়, প্রয়োজনে সমালোচনায় পরাম্মুখ নয় এমন সাথীত্বই তার কাম্য।

14 কুসংস্কারের কেবল স্বরূপ নয়, তার সামাজিক

উৎসকে বোঝার চেষ্টা করাও আমাদের কাজ।

15 শধু প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরাপদ অস্ত্র চালনা নয়, 'বৈজ্ঞানিক' কুসংস্কারের স্বরূপ উন্মোচন'ও বি-ও-বি'র লক্ষ্য।

16 কেবল ভেল্কিতে বাজী মাত করা 'ধর্মীয় গুরু'রা নয়, 'বিজ্ঞান'-এর আঙিনার গুরু-বাবাদের শঠতা, উন্নাসিকতা ও অমানবিকাতর স্বরূপ উন্মোচনও বি-ও-বি'র অন্যতম লক্ষ্য।

17 কঠোরতম সমালোচকের জন্যও বি-ও-বি'র পাতা খোলা- কথায় নয়, কাজে।

18 - মানবিকতাবোধহীন 'বিজ্ঞান-মনস্কতা'র বিরুদ্ধে

- 'বিজ্ঞান'কে 'ভগবান'-এর জায়গায় বসান'র বিরুদ্ধে

- 'বৈজ্ঞানিক' দম্ভের মূঢ়তার বিরুদ্ধে

সংগ্রামরত মানুষের সাথী বি-ও-বি।

19 'বিজ্ঞান'-এর চাট্‌নী অথবা কুসংস্কারের 'কেচ্ছা' ঘোঁটা 'বিজ্ঞান মনস্ক' উন্নাসিকতা'র চর্চা নয়, সবাই মিলে সত্যকে খোঁজাই আমাদের লক্ষ্য - আসুন, এ কাজে সাথী হিসেবে আমরা হাত মেলাই।

20 বি-ও-বি পড়বেন না। আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, কারণ, বি-ও-বি আপনাকে এক রঙা সত্যে বিশ্বাসী নানা শিবিরের সাথে আদান প্রদানের চেষ্টায় প্ররোচিত করতে পারে, যা বহু সময়েই আদান প্রদানের বদলে তর্ক-বিতর্কের, এমনকি গালাগালির চেহারা নিয়ে মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

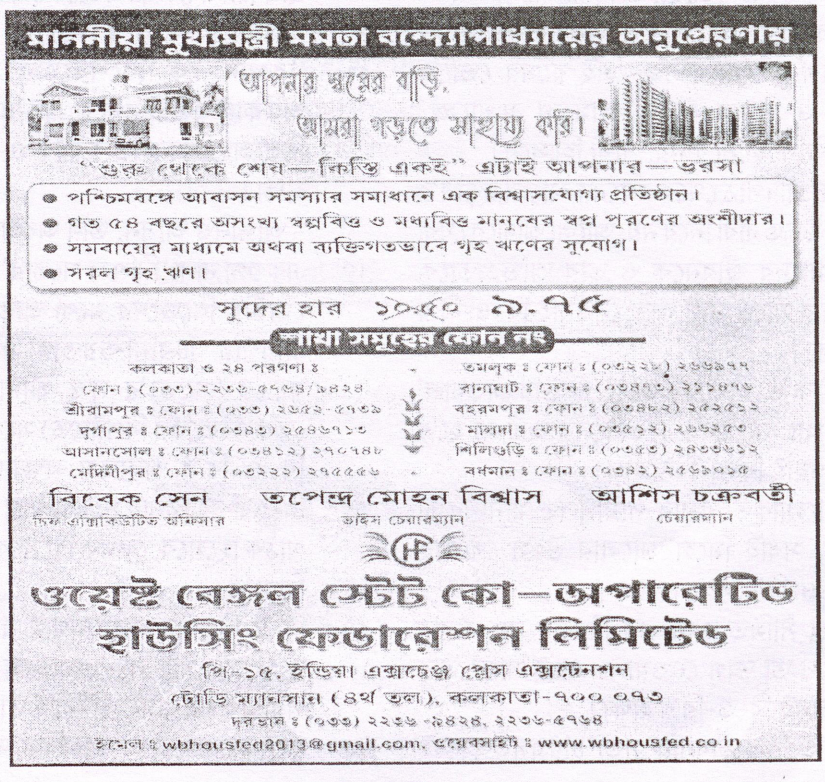

কু-সংস্কারবিরোধিতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটি চিঠির উত্তরে...

প্রিয় ধীমান পাল ও 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার অন্যান্য বন্ধুরা,

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকায় শ্রীপালের চিঠিতে (বি ও বি জুলাই-ডিসেম্বর 2018) দু'টি প্রশ্ন ছিলো: কুসংস্কার প্রসঙ্গে অনেক বিরূপ সমালোচনার উত্তরে কেন আমার কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। আর জন হরগ্যানের সাথে আমার লেখার তুলনামূলক আলোচনা পড়ে আমি কী ভাবছি।

অবশ্য 'সভ্য অন্ধ বিশ্বাস' বলে একটা ধারাবাহিক নিবন্ধমালা লিখতে শুরু করেছিলাম 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে। সেটাতেই ইচ্ছে ছিলো কিছু ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করার।

এটা এতো বছর পরে লিখতে বসে, বুঝতেই পারছি, মাঝখানে কয়েকটা দশক চলে গেছে। তাই বক্তব্য ঠিক 1984 সালের পটভূমিতে রাখা হয়তো যাবে না। আরো যুদ্ধ, আরো মৃত্যু, আরো বাস্তুহারা, আরো অনাহার, আরো রক্ত, আরো অমানবিকতা...

তবুও লিখতে চাইছি, অতি সংক্ষেপে, আবেগকে বেঁধে রেখে।

'সতী-মা' নাম বদলালো, ফুটপাতবাসিন্দারা একই রইলো

গত শতকের আটের দশকে বালীগঞ্জ ফাঁড়িতে ছিলো 'সতী-মা' মন্দির। কলকাতার 'কুসংস্কারবিরোধী' প্রচার আর রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের 'সতী' দাহের পটভূমিতে, সাততাড়াতাড়ি 'সতী-মা' নামটা পাল্টে, এখনও সেই মন্দির অন্য নামে বহাল তবিয়তে আছে। নামটা বদলালো কাদের 'সফল' আন্দোলনে, সেটা ভাবতে বসার সময়, একটা অতীত বলি-

1881-82 সালে, বালীগঞ্জ ফাঁড়ির ফুটপাত বাসিন্দাদের একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে, 'সতী-মা' মন্দিরের সামনে তখনকার আইল্যান্ডের ভেতরে ঢুকে, পাটকাঠি, বাতিল কার্ডবোর্ড আর মাটি দিয়ে, হয়তো তার স্বপ্নের, পুতুলের দোতলা বাড়ি তৈরী করতো। আমি তখন ফুটপাতবাসিন্দাদের তথ্য নিতাম, ছবি তুলতাম। তন্ময় হয়ে দেখতাম সেই শিল্পী মলিন মেয়েটির স্বপ্নের খেলনা বাড়ি।

বালীগঞ্জ ফাঁড়ির ফুটপাতের সে মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে। এখন সে প্রায় বুড়ি, কিন্তু ফাঁড়ির ফুটপাতেই থাকে, খায়, শোয়। শুধু গত 38 বছরে বালীগঞ্জ ফাঁড়ির 'সতী-মা'র মন্দিরের নাম পাল্টেছে, তাতে ফুটপাতবাসিন্দাদের কোনো তফাৎ হয়নি।

তখনকার 'কুসংস্কারবিরোধী'দের বালীগঞ্জ ফাঁড়ির মন্দিরটার ছোট্টো 'সতীমা মন্দির' নামাঙ্কিত ফলকটাই শুধু চোখে পড়েছে। চোখে পড়েনি তার ঠিক পাশে ফুটপাতবাসিন্দা বহু অসহায় নিরাশ্রয় অভুক্ত অপমানিত মানুষদের। এই 'কুসংস্কারবিরোধী' চোখ তো সত্যিই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত!

আটের দশকের শুরুতেই ছুটতে হয়েছে, গড়িয়াহাটের বুলেভার্ডের বাসিন্দা মেয়েটিকে বাঁচাতে সময় গেছে, যার পায়ের ওপর দিয়ে ভদ্দরলোকের গাড়ি চলে গেছে বলে পায়ে ক্ষতবিক্ষত। যে ঘা ক'দিন পরে পচে গেলো। মেয়েটা মরে গেলো।

আজ 2020 সালের শুরুর রাতে কন্‌কনে ঠান্ডা

শীত। আমি বা আমরা 'বিজ্ঞানমনস্ক'রা অনেক গরম পোষাক পরে, ঘরে বসে বিদগ্ধ নিবন্ধ লিখছি। কিন্তু, বালীগঞ্জ তথা কলকাতার ফুটপাতের মানুষেরা খোলা আকাশের তলায় প্রাণপণে বাঁচার লড়াই করছে, বেঁচে থাকছে। হয়তো তারা তামা-তাবিজে বিশ্বাস করে।

সেদিনের একটি অলিখিত বিস্ফোরক সত্য

1975 সালে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সব থেকে নির্মম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণ সন্ত্রাস নেমে এলো, 'অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা'! আর সেই নিপীড়ণ 1976 সালে প্রসব করলো ভারতীয় সংবিধানের ভয়াবহ 42-তম সংশোধন। সেই সংশোধনেই প্রথম যুক্ত হলো ভারতীয় সংবিধানের 'খন্ড-4এ' 'মৌলিক কর্তব্য'। যার 51-এ(এইচ) ধারায় সংবিধানের ইতিহাসে প্রথম যুক্ত হলো, 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বিকাশ' করার কথা (**PART IVA**, FUNDAMENTAL DUTIES, 51A. It shall be the duty of every citizen of India– (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform)। সংশোধন চালু হলো, 3 জানুয়ারী 1977 সালে, তখনও 'অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা' চলছে।

সেদিন বা আজও মানতে বা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও, তখনই শুরু হলো 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা'র উত্তাল অথচ রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিপ্রদত্ত নিরাপদ ঢেউ।

আমরা তখন আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী। তুর্কামান গেট ভেঙে পড়েছে, জেলখানা উপচে পড়ছে বন্দীর সংখ্যায়, প্রতিদিন 'আমদানি'তে নতুন কয়েদী। কিন্তু তাকাও হাঁচি, টিকটিকি, করকোষ্ঠী, তুকতাকের দিকে। দেখো না, 'মিসা' বন্দীত্বের মেয়াদ অনির্দিষ্ট, ভুলে যাও সাতের দশকের প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে হাজার দুয়েক বন্দীর সঙ্কুলানে ছিলো সাড়ে চার হাজার বন্দী! রাষ্ট্র একটা নেশা ধরাতে ভুল করেনি, 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা', সব থেকে নিরপাদ আশ্রয়! সেই জরুরী অবস্থাতেও 'ই-পি-ডব্লিউ' (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি) পত্রিকায় 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা'র জয়ধ্বনি, কেরলের কথা জেলে বসেই পড়েছি! তার পরেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় 'কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন', সেটাই না কি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা!

এমন একটা সময়ে, যখন সমগ্র ইউরোপে তথা পৃথিবীতে প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে। আমরা 'বাঙালী' সেই প্রাগৈতিহাসিক নিরক্ষর, 'বাবু বিলাস' নিয়েই রইলাম। 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' নাগরিকদের 'মৌলিক কর্তব্য'! কিন্তু তাদের প্রধান বা অপ্রধান, আধা বা পূর্ণ মন্ত্রী, নেতা, প্রশাসন, মস্তান, দাদা, বড়ো মন্দির প্যান্ডেলের এই 'মৌলিক কর্তব্য' থেকে 100 শতাংশ 'ছাড়'। তারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পূজো প্যান্ডেলে উদ্বোধন, খুঁটি-পূজো থেকে শুরু করে শত সহস্র কাঁচকলা দেখানোর জোয়ার আনলো, ভারত নামক 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে।

সেই 1984 সালে 'কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন' নিয়ে যখন লিখি, তখন অজস্র সহস্র কথা, 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা'র জন্মবৃত্তান্ত আর এক ঐতিহাসিক সুবিধাবাদী আন্দোলনের চরিত্র-তথ্য উহ্য ছিলো ইচ্ছাকৃতভাবেই। তখনকার লেখার ভিত্তিটা ছিলো, হতদরিদ্র নির্যাতিত মানুষের জীবনকে দেখা ও অনুভবের যন্ত্রণা। কখনোই সামান্যও তর্ক-বিতর্ক সওয়াল-জবাব করার জন্যে নয়। আমার শেষ কৈশোরের একটা বইয়ের কথা ভীষণ মনে পড়ে, লিঙ্কন বার্নেট্-এর 'দ্য ইউনিভার্স্ অ্যান্ড্ ডক্টর্ আইনস্টাইন'। একটি শিশু পাথরের

ক'টা গুলি জমিতে গড়িয়ে দিলো। দশতলা বাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী নিউটন দেখলো হরেক রকম 'ফোর্স' বা বলের নিয়মাবলী। আর জমির ওপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখলো, কোনো 'বল' নয়, জমিটাই এবড়ো-খেবড়ো, অর্থাৎ 'স্পেস-টাইম'টাই এবড়ো-খেবড়ো, তাই এক একটা গুলি এদিক ওদিক গড়িয়ে যাচ্ছে। এই উপমাটা চিরদিন মনে গেঁথে ছিলো।

দশতলার ওপর থেকে অনেক 'কু'-সংস্কারকে দেখা যায়। কিন্তু অবিশ্বাস্য অসমান এবড়ো-খেবড়ো জীবনকে দেখলে, ভাঙাচোরা জীর্ণশীর্ণ জীবনে বেঁচে থাকার এবড়ো-খেবড়ো যুদ্ধক্ষেত্রটাই চোখে পড়ে।

ভারতের ইতিহাসে ধর্ম-দর্শন আর ধর্মাচরণ দুটো শত শত বছর ধরে আলাদা পথে, কখনো কখনো বিপরীত পথে হেঁটেছে। নিজের সুবিধার্থে রাষ্ট্র, নেতা, 'পন্ডিত', প্রতিষ্ঠান ধর্মাচরণের দুরাচার, মিথ্যাচার, অনাচার মদত দিয়েছে, মেনে নিয়েছে, 'ঐতিহ্য' বলে প্রচার করেছে, ধ্বংস করেছে ইতিহাস, সামাজিক সম্পর্ক, অসংখ্য মানুষের বেঁচে থাকার উপায় উপকরণ, মানবিকতা। কই, তার সম্বন্ধে একটা কথা, লেখা, গ্রন্থও তো 'কু-সংস্কার বিরোধিতা'য় দেখিনি।

একটি অসহ্য মন্তব্য বা স্বীকারোক্তি

পরিণত যৌবনে আব্রাহাম কভুরের 'বিগান গড্‌মেন' অত্যন্ত অ-পরিণত আর ছেলেমানুষী লেখা বলে মনে হয়েছে। না পড়লে ক্ষতি হতো না। কারোরই ক্ষতি হবে না।

কিন্তু পরিণত কৈশোরেই (1961-62) স্বাদ পেয়েছিলাম এক আশ্চর্য আলোক দর্শনের, জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন্-এর 'ব্ল্যাক লাইক মি' গ্রন্থটিতে। প্রথমে ইংরেজিতে পড়িনি। তখন 'আলো থেকে অন্ধকারে' নামে সংবাদপত্রে ধারাবাহিক অনুবাদে পড়েছিলাম। তখন থেকে হাতড়েছি, 'ব্ল্যাক লাইক মি' মূল গ্রন্থ। আমেরিকার কালো নিগ্রোদের জীবনকে জানতে, হাওয়ার্ড গ্রিফিন নিজেকে নিগ্রোদের মতো করে তাদের বস্তিতে থেকেছে, তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে।

এ গ্রন্থ প্রত্যেক মানুষের অবশ্য পাঠ্য। আর তার সাথেই এর খোঁজের শেষে বাড়তি পাওনা, গ্রেস্ হ্যাল্‌সেল্-এর 'সোল সিস্টার'। অবশ্য পাঠ্য, কিন্তু সহজলভ্য ছিলো না। এ আলোকবর্তিকার পাশে, সমস্ত 'কু-সংস্কার' বিরোধিতা ম্লান হয়ে যায়। সারা জীবন, এমনকি জীবন সায়াহ্নে, ভাবতে চেষ্টা করি, 'ব্ল্যাক লাইক মি'- এ দেশের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষ, 'আমার মতো'। আর সেদিন, আমেরিকান শ্বেত সাংবাদিকতা, সভ্যতা নগ্ন হয়ে পড়েছিলো জন হাওয়ার্ড গ্রিফিনের 'বর্ণবিদ্বেষ'-বিরোধী 'বর্ণবৈষম্য'-বিরোধী কাজে! জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন্ তার কাজের জন্য গত শতকের ছয়ের দশকের শুরুতে যে আক্রমণ লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে, আমি বা জন হরগ্যান তার শত ভাগের এক ভাগ আঘাতও পাইনি। এক আশ্চর্য অথচ আবশ্যিক সে ইতিহাস জানা। জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন্ নিজেই সেই কদর্য আক্রমণ লাঞ্ছনার বিবরণ লিখে রেখে গেছে তার 'ব্ল্যাক লাইক মি' বইয়ের নতুন সংস্করণে, ততো দিনে তার বিক্রী পঞ্চাশ লক্ষ কপি পার হয়ে গেছে!

খানিকটা জোর করেই 'বর্ণবৈষম্য', 'জাতপাত' বা 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দগুলোকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয়, জেনে বুঝে আর্থিক শ্রেণীবৈষম্যকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে। পারতপক্ষে, খুব সতর্ক সুবিধাবাদী পদক্ষেপে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' তাই 'কু-সংস্কার'

খুঁজেছে।

ইচ্ছাকৃত অন্ধ ঘুমন্ত বধিরদের উন্মত্ততার উত্তর দেয়া?

আমি গরীব উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। কিছু বছর ইস্কুল, কলেজ, শিক্ষানবীশী, ইত্যাদির থেকে অনেক বেশি শিক্ষা পেয়েছি বিস্তৃত বৃহৎ জীবনকে দেখে অনুভব করে, বিশেষত প্রায় সাড়ে চার বছর বাঁকুড়ার মানুষের সাথে থেকে - আমি তাদের মতো। 1972 সালের কাছে, এন্সেফ্যালাইটিস মহামারীতে 'সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল'-এর বারান্দা চাতাল ভরে গেছে! শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশের গাঁ থেকে কোলে করে মৃতপ্রায় রোগীকে আনতে হতো প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে ছাতনায়। সেখানেও নিয়মিত যানবাহন নেই! এই মৃত্যুর মিছিলে, আমি দর্শক!

ভাদ্র মাসে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে ছেলে কোলে মা ঝাঁপ দিয়েছে চলন্ত ট্রেনের সামনে। ভূমিহীন চাষির বাড়িতে এক কলসি জলে এক মুঠো চাল দিয়ে ঘোলা জলকে 'ফ্যান' বলে সারা পরিবার খেয়েছে। কল্পনাতীত গ্রীষ্মকালে, দ্বারকেশ্বর নদীর বুকে মরে পড়ে আছে গরু। তার পাশেই, নদীর বুকে গর্ত করে, জল ছেঁচে তুলেছে, দরিদ্র মানুষেরা। সেই মানুষদের 'কু'-সংস্কার, তাবিজ-মাদুলি দেখার প্রবৃত্তি হয়নি। তখন পোড়ামাটির ঘোড়া বা 'মনসার ঝাড়ি', অপূর্ব শিল্পকীর্তি বলেই মনে হয়েছে। এগুলো তো তাদের দুর্দিন দুর্দশাকে আনেনি।

আটের দশকে সুন্দরবনে 'জেলে' সেজে মিথ্যে সরকারী 'পাশ' নিয়ে ঘুরেছি। গোসাবার মালোপাড়াকে, জেলে কাঠুরে মৌলেদের জীবন দেখে, আর 'মান্দাস' দেখে অন্যমনস্ক হতে পারিনি। মালোপাড়ার ডাকনাম 'বিধবাপল্লী', কারণ, বেশীর ভাগ 'মালো' বা জেলের স্ত্রীরা বিধবা! স্বামীরা বাঘের পেটে, সুন্দরবনের খাড়ি নদীতে মাছ ধরতে।

আমার নৌকার কয়েকবার সঙ্গী বা গাইড ছিলো, গোসাবার দুরন্ত দামাল সাহসী যুবক কানাই। গোসাবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তার যৌবনের প্রেমিকা স্ত্রীর প্রথম সন্তান প্রসবের পরেই শুরু হলো অবিরাম রক্তক্ষরণ! নিয়ে যেতে হবে ক্যানিঙে, ভুটভুটি করে গেলেও, লাগবে চার সারে চার ঘন্টা! সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে কানাইয়ের স্ত্রী বাঁচলো না। কানাইয়ের একমাত্র সন্তান যখন বছর তিনেক, কানাইকে দেখলাম শান্ত, নির্বাক, নিশ্চল। বললো, 'এ কানাই, সে কানাই নেই'! ওকে কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি, ও বনবিবি, মাদুলি বা ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে কিনা!

বাংলার মানুষের 'সংস্কার', 'কু' না 'সু', তা জানার জন্যে দূরে নয়, কলকাতার সরকারী হাসপাতালগুলোর, শিশু হাসপাতালের গাছতলায় প্লাস্টিকের শিট পেতে চিকিৎসার আশায় বসে-শুয়ে থাকা অগণিত অসহায় মানুষই তো 'স্যাম্পল্'। ওদের সব থেকে বড়ো বিশ্বাস, ওরা কলকাতায় অসুখের চিকিৎসা পাবে।

'সব্ ঝুট্ হ্যায়' বলছো কতোটুকু অসত্যকে?

পাগলা মেহের আলির চিৎকার, 'সব ঝুট্ হ্যায়'!

কিন্তু কতোটুকু অসত্যের বিরুদ্ধে? জ্যোতিষী, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, তামা-তাবিজ-মাদুলি,করকোষ্ঠি? ব্যাস্, আর কিছু নয়? আমরা, বিশেষত ভারতীয় বাঙালীরা দাঁড়িয়ে আছি যে অসত্য, অমানবিকতার ওপর, সেগুলো 'ঝুট্' বলে আক্রমণ করবে কে?

বিজ্ঞান? কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের বিজ্ঞান? নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক মানের প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র এই শিক্ষালয়। তবুও এরই সূত্রে কয়েকটা

বিজ্ঞান-বহির্ভূত (অ-বৈজ্ঞানিক?) কথা বলতেই হয়!

একটা ক্যুইজ্ বা ধাঁধা দিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় বা কু-সংস্কারবিরোধী পন্ডিত নেতাদের জন্যে-

1) আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর নামে কলকাতার কোন্ রাস্তাটি?

2) কলকাতার বিখ্যাত দীর্ঘ রাস্তা 'রাসবিহারী অ্যাভিনিউ' কার নামে?

3) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ 'রাসবিহারী অঙ্গন'-এ। এই রাসবিহারী কে?

প্রশ্ন 1-এর উত্তর - কলকাতার দারুণ ঘিঞ্জি বাজারের ছেটো সংকীর্ণ ক্যানিং স্ট্রীটের নাম বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নামে!

প্রশ্ন 3-এর উত্তরে 2-এর উত্তর অনুমান করা যায়! আর সে উত্তর হলো- রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের 'রাসবিহারী অঙ্গন' হলো ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত উকিল রাসবিহারী ঘোষের নামে। তার সব থেকে বড়ো কারণ, এই রাসবিহারীর অনেক টাকার অনুদান পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! কিন্তু এই রাসবিহারী ঘোষের অনেক বড়ো কর্মকান্ডের কথা 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' জানে না, না কি গোপন করে। আমি যখন 'রাসবিহারী' অঙ্গনের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যেতাম, তখন মনে হতো, বিরাট অট্টালিকার অন্দর থেকে ধর্ষণে রক্তাক্ত 'সুকুরমণি'র চিৎকার শুনতে পাচ্ছি- 'মাগো! মরে গেলাম!' আমি কি বিজ্ঞানবিরোধী? কু-সংস্কারচ্ছন্ন? আমার তাতে আপত্তি নেই!

ব্রিটিশ শাসনে আসামের চা-বাগানের জন্যে লঞ্চে করে অনেক কুলি নিয়ে যাচ্ছিলো, ইংরেজ কুলি-ঠিকাদার চার্লস্ ওয়েব। সুকুরমণি নামে এক মহিলা কুলিকে নিজের কেবিনে নিয়ে সারারাত অত্যাচার করে চার্লস্ ওয়েব। ভোর বেলা রক্তাক্ত দেহে সুকুরমণি কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে কাঁদতে কাঁদতে- 'মাগো! মরে গেলাম!'

বিচারে চার্লস্ ওয়েবের শাস্তি ও জরিমানা হয়, অবশ্যই খুবই সামান্য। তবুও ইংরেজ ঠিকাদার, প্রেস্টিজ আছে না! তাই উচ্চতর আদালতে আপীল করে, চার্লস্ ওয়েব বেকসুর খালাস পায়। ইতিহাস আর বিচারের নথিপত্রে জ্বলজ্বল করছে, চার্লস্ ওয়েবের পক্ষের উকিলের নাম, রাসবিহারী ঘোষ। এমন দক্ষ আইনজীবিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক 'ডি.লিট' প্রদান করে। 'রাসবিহারী অঙ্গন'-এ আমি আজও সেই ইতিহাসকে মনে করি!

সেই ছোটোবেলা থেকে 'বাংলার শেষ নবাব' সিরাজদ্দৌল্লাকে জেনেছি। আর জেনেছি 'বিশ্বাসঘাতক' মির্জাফর্! কিন্তু, প্রথম যৌবনেই সেটা 'ঝুট্' হয়ে গেলো, মহীরুহ ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের কলমকর্মে। সিরাজদ্দৌল্লার সমসাময়িক এক ইতিহাসবিদের পারসিক্ গ্রন্থে প্রকাশ পেলো সিরাজদ্দৌল্লার কদর্য ঘৃণ্য চরিত্র।

লর্ড বেন্টিং যখন সতীদাহ প্রথা রদ করার আইন আনলো, রামমোহন রায় তার বিরোধিতা করেছিলেন! তারপর....

'বিপ্লবী' ক্ষুদিরাম, দায়রা আদালতে কিংসফোর্ডকে বোমা ছোঁড়ার কথা লিখিতভাবে অস্বীকার করেছিলেন। ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর ক্ষুদিরাম বড়লাটের কাছে 'ক্ষমাভিক্ষা' চেয়েছিলেন! নথিপত্রে 'হাসি হাসি পরবো ফাঁসি' ঝুট্ হয়ে গেলো!

বিশ্ববিজ্ঞানের দরদারে জ্যোতিপদার্থবিদ্যার আকর্ষণীয় বিষয়, 'ব্ল্যাকহোল'। কলকাতা, বাংলা, ভারতের চরম লজ্জা যে, এই নামটির উৎপত্তি 1756 সালে কলকাতায়! 'ব্ল্যাকহোল' জন্ম নিলো 'বাংলার

শেষ নবাব' সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমণ আর ফোর্ট উইলিয়ামের ইংরেজদের ছোটো একটা ঘরে বন্দী করে অত্যাচার করার মধ্যে দিয়ে। এটাই কুখ্যাত 'ব্ল্যাকহোল ম্যাসাকার'! 'ব্ল্যাকহোল' বিজ্ঞান নয়, ইতিহাস হয়ে রইলো আমার কাছে!

রাজা নন্দকুমারকে ফাঁসির হুকুম দিলো, বিচারক এলাইজা ইম্পে। তার বিরুদ্ধে এমন কি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পন্ডিতরা প্রতিবাদ করেছিলো। সেই বিচারক এলাইজা ইম্পের একটা ডিয়ার পার্ক ছিলো যেখানে, সেটার নাম হলো 'পার্ক স্ট্রীট্'!

এমনই সব কদর্য কদাকার কলঙ্ককে জেনে বুঝে দেখেও, তার সাথে নিঃশব্দে নিরবে সহবাস আমাদের। তাই, হাঁচি-টিকটিকি-ভূত-প্রেতের মতো নির্ভেজাল নিরাপদ বিষয়ে নিয়ে সশব্দে 'কু-সংস্কারবিরোধী' হওয়ার ঢেউ তো 'যুক্তিবাদী' প্লাবন হয়ে আসবেই।

'সভ্যদূষণ' আর চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুখানি চ, দুখানি চ.....

প্রথম যৌবনে পেশাগত অবস্থানে, কলকতার নাড়ীনক্ষত্র চিনতে হয়েছে। তখন, ভুলতে পারি নি, কলকাতার জনসংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ বস্তিবাসিন্দা! অর্থাৎ কলকাতার সমস্ত মিছিল সভা সমিতির এক-তৃতীয়াংশ বস্তিবাসিন্দা না হলে, সেটা পুরো 'কলকাতা' নয়। এর মধ্যে ফুটপাতবাসিন্দা আর ঝুপড়িবাসিন্দা বাদ! কারণ তারা সরকারীভাবে নথীভূক্ত নয়! এই সব 'সভ্যদূষণ'-এ তাই পথে পথে 'শনির থান', জ্যোতিষীরা খুব চোখ বা মন কাড়েনি।

এই গণনার মধ্যে রেল লাইনের ধারের ঝুপড়ি-বাসিন্দারা বাদ। বাদ পড়েছে, কলকাতার ফুটপাতবাসিন্দা হাজার হাজার মানুষ। আমি ওদের সাথে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দেশে গিয়ে দেখেছি, ওদের বাড়ি ঘরদোর সব আছে। নেই খালি খাবার জোগানোর উপার্জন। ওরা ভিক্ষে করে না। ওদের মেয়েরা দেহ বেচে না। ওদের অস্তিত্ব সভ্যতার সব থেকে বড়ো দূষণ।

বরঞ্চ, দারাপাড়া বস্তির ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার 'মৃত্তিকা' গানের দলের অনুষ্ঠানে আফসানা অনুপস্থিত হওয়ার কারণ জানলাম পরে। ওর দাদা একটা নতুন ছোটো রেডিও কিনেছিলো বলে, লোকে 'চোর চোর' বলে তাড়া করে। আফসানার দাদা রেল লাইন ধরে ছুটে, ট্রেনে চাপা পড়ে মারা যায়। ওদের হাতে যে রেডিও থাকতে নেই!

1978 সালে, সি.আই.টি রোডের ফুটপাত বাসিন্দারা ফরেন্সিক ইন্সটিটিউটের জানলায় বসে রইলো দিনরাত কয়েক দিন। সি.আই.টি রোড জলে ডুবে গেছে। ডুবে গেছে ওদের বাসা।

এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে কি জানতে হবে, এ মানুষগুলো তাদের 'কপাল'কে বিশ্বাস করেছিলো কি না, ঈশ্বরের নাম জপেছিলো কি না!

কেন কোয়েট্স্ লিখেছেন Poverty: Forgotten Englishmen, ইংল্যান্ডের অন্তরালে দরিদ্র মানুষকে নিয়ে। নতুন করে ভাবতে শুরু, সভ্যতার অন্তরালের দারিদ্র্য। আর শিক্ষা? তায় আবার বিজ্ঞান!

কাদের, ক'জনের জন্যে শিক্ষা!

অত্যন্ত সুকৌশলে অনেক তথ্য গোপন করলেও, বাংলা তথা ভারতের দুর্গতির চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

2013-14 সালে, সারা ভারতে 19.8 শতাংশ পড়ুয়া প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে বিদ্যালয় ছেড়েছে।

36.3 শতাংশ পড়ুয়া প্রথম থেকে অষ্টম

শ্রেণীতে বিদ্যালয় ছেড়েছে।

47.4 শতাংশ পড়ুয়া প্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে বিদ্যালয় ছেড়েছে। [Levelwise Drop Out Rates in School Education (Educational Stastics at a Glance, Government of India, Ministry of Human Resources Development, New Delhi, 2014), Data Source: U DISE 2013-14 (Provisional)]

আর পশ্চিমবঙ্গে 2007-08 সালে, 39.73 শতাংশ পড়ুয়া প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে বিদ্যালয় ছেড়েছে।

63.88 শতাংশ পড়ুয়া প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বিদ্যালয় ছেড়েছে।

77.68 শতাংশ পড়ুয়া প্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে বিদ্যালয় ছেড়েছে। [West Bengal Education Indicators (2007-08) Dropout rates (%), (Survey of ICTs for Education in India and South Asia, Case Studies 2010)]

সর্ব ভারতের তুলনাতেও পশ্চিমবঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানে বিশাল পিছিয়ে। এই বিপুল সংখ্যাক স্কুলছুট ছেলেমেয়ে যাচ্ছে কোথায়? উত্তর মেলে না? না কি 'মনস্কতা', 'মানসিকতা'র জন্মকুন্ডলী প্রকাশ হয়ে পড়বে!

এখন তো এ দেশে আরও নগ্ন এই 'সভ্যতা', মানুষ অবিরাম তাদের আশ্রয় হারিয়ে ছুটে চলেছে অনিশ্চিতের দিকে। তাদের জীবনে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসে দুঃখ, দুঃখ...

বলতেই হলো, কূপ-মন্ডুক 'যুক্তিবাদ' বিপুলা এ পৃথিবীর কতোটুকু জানে?

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, হাঁচি-টিকটিকি-জ্যোতিষি-তামা-তাবিজ-মাদুলির রহস্য ভেদ করার মনস্কতা জরুরী। তা হলেও 'কু-সংস্কারবিরোধিতা', 'যুক্তিবাদী', এমন কি সগৌরব 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' কার্যত অবশেষে হয়ে দাঁড়ায় একটা অন্ধ অমানবিক সবজান্তা কুয়োর ব্যাঙ! যার না আছে সত্যিকার বিজ্ঞানমনস্ক অনুসন্ধিৎসা, না উদার মানবিক মেধা ও গভীরতা। বরঞ্চ, একটা একটা দায় এড়ানো, গা বাঁচানো, তরল সুবিধাবাদ।

সব শেষে, নিজের কাছে, সবার কাছে, সারাক্ষণ প্রশ্ন রাখি, 'আমরা কি সব কিছুর ব্যাখ্যা, কারণ জানি?' শেক্‌স্পিয়ারের ভাষায়, There happens more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosphy।'

নিজে খুব কম জানি বলে, সব সময় আমার অজানাকে জানতে ইচ্ছে করে। সেই ছোটোবেলা পত্রিকায় একটা ধারাবাহিক পড়তাম, 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না'। পরে বই আকারে প্রকাশিত। খুব মজা পেতাম। ভূত-প্রেতের বই নয়, নামেই পরিচয়। বড়ো হয়ে পড়লাম, প্রিয় বিজ্ঞান-কাহিনী লেখক আর্থার সি ক্লার্ক (Arthur C. Clarke)-এর রহস্য নিয়ে গভীর লেখাগুলো। তিনিই তো লিখেছেন, কিছু রহস্য 'মেকি রহস্য' বা phoney mysteries। আবার সত্যিকারের রহস্যের ক্ষেত্রে, যতো বেশি রহস্যের আশ্চর্যজনক চরিত্র আমরা অস্বীকার করবো, ততো রহস্যটি ঘনীভূত হবে (a mystery got deeper and deeper the more we investigated, we weren't ashamed to admit total bafflement)।

বরঞ্চ আমরা কম জানি, এটা মানুষকে বোঝাতে পারলে, অনেক বেশি সুখের (we are very happy to know that we made people realize that there's a lot more in the universe than meets the eye (and sometimes, a good deal less)।

আমি এটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, আমি সব জানি না।

সৌমেন গুহ
(saumenguha@rediffmail.com)

With Best Compliments From :

M/s. SOURABH KUMAR ROY

Govt. Contractor & Program Management Organizer

JHARGRAM, WEST BENGAL

পড়বার মত বই/পত্রিকা ও অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ

প্রয়াত বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের একটি পরিচিতি ও ছবি উইকিপিডিয়ার নিচের দুটি URL-এ পাওয়া যাবে-

পরিচিতি **Draft : Bishuddhananda Purokait**

http://speedydeletion.wikia.com/wiki/Draft:Bishuddhananda_Purokait

ছবি File : Bishuddhananda Purokait.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/ File : Bishuddhananda Purokait.jpg

বিজ্ঞান সমাজ ও মানুষ সৌমেন গুহ'র নির্বাচিত রচনার একটি সংকলন (ই-বুক) পড়া যাবে-

http://sites.oggole.com/site/saumenguha1

অধ্যাপক মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার-এর বই

1. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, 2014)

2. বাংলায় আর্সেনিক প্রকৃতি ও প্রতিকার, দ্বিতীয় সংস্করণ (ভাষাপ্রকাশ, সোনারপুর, কলকাতা, 2010

3. Low-Level Chemical Pollution, Endocrine Disruption and The Imperilled Biosphere
(Indian Social Science Congress, Allahabad, 2010)

শিবপ্রসাদ নিয়োগী'র একটি ইতিহাস সংক্রান্ত বই ও অন্য দুটি কবিতার বই

1. আলো-আঁধারির উত্তরাধিকার বাঙলার নবজাগরণ (কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, 1 বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-1

2. পিছুডাক (নানামুখ, নিলয় রায়, 1/1 কেদারনাথ ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা - 700 036

3. নিমযুগ (কালধ্বনি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, 2/1এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা - 700 091

অভিজিৎ লাহিড়ী'র একটি ওয়েবসাইট যেখানে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত **"Basic Physics : A Comprehensive Survey", "Science as an Interpretation of the World: Inference and Belief"** ও আরও কয়েকটি বই-এর পরিচিতি এবং পদার্থবিদ্যার উপর নানা আলোচনা পাওয়া যাবে - http://physicsandmore.net

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী'র দুটি বই

1. HUNDRED SONGS OF RABINDRANATH TAGORE-*Inner journey through the original songs by way of translation* (প্যাপিরাস, 2, গণেশ মিত্র লেন, কলকাতা - 700 004)

2. THE FORGOTTEN MESSAGE FROM THE PIOBNEER OF 'SCIENCE'
VS.
INSTITUTIONAL 'SCIENCE' EDUCATION & 'SCIENTIFIC' SOCIAL ACTIVISM
(রূপালী, 206 বিধান সরণী, কলকাতা - 700 006, ফোন 9432062928/8479912362)

Writings of Subhas Chandra Ganguly : An Open Access E-book
http://site-google.com/site/subhascganguly/writing

RANDOM THOUGHTS http://sites.google.com/site/writingsofsganguly/

অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ ও পড়বার পত্রিকা

আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, তেঘরি, বাঁকুড়া

শ্রমজীবী হাসপাতাল, বেলুড় (বালি), শ্রীরামপুর (বড় বেলুড়)

সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, এফ. এস. হাট, সারবেড়িয়া, মুখপত্র- লোকগাথা

লোভায়ত কৃষি - পশ্চিমবঙ্গ সুস্থায়ী কৃষি বিকাশ মঞ্চ, মো 8017642999

প্রয়াত কবি সমর সেন প্রতিষ্ঠিত-সম্পাদিত ও বর্তমানে তিমির বসু সম্পাদিত, গত 51 বছর ধরে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক Frontier- ফোন 2265 9202

ওয়েবসাইট http://frontierweekly.com

Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 34929/79

Rs. 30.00

Vol. XLII No. 1-4
January - December 2019

প্রত্যেক বছরে সারা বিশ্বে ৫০ হাজার কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয়

প্রতি বছর, আনুমানিক ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে জমা হয় যা প্রতি মিনিটে এক ট্রাক বর্জ্যের সমান

আমাদের ব্যবহার্য প্লাস্টিক–এর ৫০ শতাংশ হল একক ব্যবহার্য বা নিষ্পত্তিযোগ্য

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিককে কেন না বলবেন?

- প্লাস্টিক ব্যাগ বা প্লাস্টিক সামগ্রীর পচন হয় না
- খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিক মিশে যাওয়ায় বহু গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে
- শহরাঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে
- ভূমি ও সমুদ্র দূষণ ছাড়াও সামুদ্রিক প্রাণীর চরম ক্ষতি করে এই প্লাস্টিক
- প্লাস্টিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে

বিগত শতাব্দীতে যা প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী উৎপাদিত হয়েছে গত এক দশকে

আমরা প্রত্যেক মিনিটে ১০ লক্ষ প্লাস্টিক বোতল ক্রয় করি

আমাদের উৎপাদিত সমস্ত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে ১০ শতাংশই হলো প্লাস্টিক

WEST BENGAL

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইন্টারনিটি প্রেসের পক্ষে এস.এন. আর্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 17A, যোগীপাড়া বাই লেন, কোলকাতা - 700 006 থেকে মুদ্রিত।